আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

মাসিক সুন্নীবার্তা

১৯২

SUNNI BARTA

১৯২ তম সংখ্যা মে'১৭ রমজান ১৪৩৮ হিজরী

খোশ আমদেদ মাহে রমজান

BJS

BANGLADESH JUBOSENA

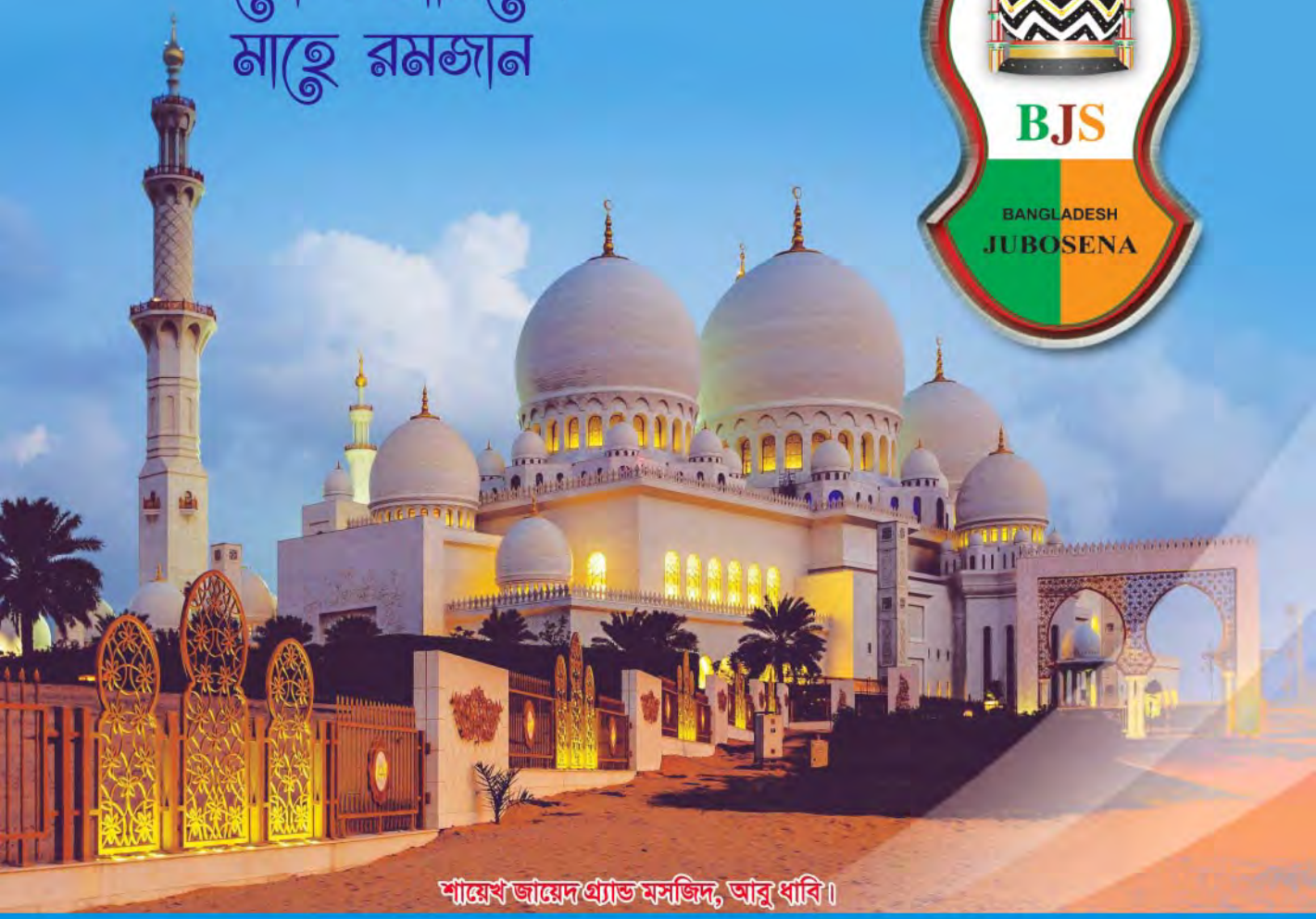

শায়েখ জায়েদ গ্র্যান্ড মসজিদ, আবু ধাবি।

প্রচারে: গাউসুল আযম রেলওয়ে জামে মসজিদ

E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website : www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com

দরসে হাদীস

হক্কানী আলেমে দ্বীনের জন্য নবীজির দোয়া

মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি-"আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করবেন- যে আমার কোন (হাদিস) শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে- ঠিক সেভাবেই অন্যজনের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। অনেক সময় এরূপ হয় যে, মূল হাদীস শ্রবনকারীর চাইতে যাদের কাছে বর্ণনা করা হয়, তারা অনেক বর্ণনাকারীর চেয়েও অধিক বোধসম্পন্ন এবং সংরক্ষনকারী হন"। (সূত্র : তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, দারেমী শরীফ ও মিশকাত শরীফ - ৩৫ পৃষ্ঠা)

বর্ণনাকারীর পরিচয় : রাবীর নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম মাসউদ, উপনাম আবু আবদির রহমান আল হুযালী। মুস্তাদ্‌রাকে হাকেম ও ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি নিজেই বলতেন, আমি ৬ষ্ঠ মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তাই তিনি প্রথম যুগের মক্কী মুসলমান।

ইসলাম গ্রহণের পর হতে প্রায় সময়ই তিনি নবীজির সফরসঙ্গী হতেন এবং তাঁর উযুর পানি ঢেলে দিতেন, মিসওয়াক এবং জুতা মোবারক বহন করতেন। অসীম সাহসী এই সাহাবী সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এমনকি পরবর্তীতে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) এর খেলাফত আমলে ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ২০ হিজরী সনে তিনি কুফার কাজী নিযুক্ত হন। একই সাথে বাইতুল মাল, ধর্মীয় শিক্ষা এবং মন্ত্রীত্বের দায়িত্বও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। হযরত আলী (রা:) এর যুগে তিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন। হযরত আলী (রা:) তাঁর রায় মানতেন। তাই হানাফী মাযহাবের অন্যতম ভিত্তি হলেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রা:)। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৮৪৮। হযরত আবু বকর (রা:), হযরত ওমর (রা:), হযরত উসমান (রা:) ও হযরত আলী (রা:) সহ প্রসিদ্ধ সাহাবিগণ তাঁর নিকট হতে অনেক হাদীস শরীফ শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীস ও ফিক্বাহ্ বিশারদ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : যুগে যুগে যারা হাদীস শরীফের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন -আলোচ্য হাদীস শরীফে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি দোয়াই মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নিঃসন্দেহে মকবুল। এ কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, দীর্ঘ দেড় হাজার বছর পরও প্রিয় নবীজির পবিত্র বাণীসমূহ বর্তমান প্রজন্ম যে নিখুঁতভাবে পেয়েছে, তা খুব সহজে আসেনি বরং এর পেছনে ছিল একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ মনিষির অক্লান্ত পরিশ্রম।

হাদীস সংকলনের দীর্ঘ ইতিহাস এখানে উপস্থাপন করার অবকাশ নেই কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে। কিন্তু যেটুকু না বললেই নয়- হাদীস সংকলনের প্রাথমিক পদ্ধতি ছিল শুনে মুখস্থ করে রাখা, আর অন্যজনের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। প্রাথমিক যুগে হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, তখনও পবিত্র কুরআন নাযিল সমাপ্ত হয়নি। ধাপে-ধাপে পবিত্র কুরআনের বাণী অবতীর্ণ হচ্ছিল। আর সাহাবীরা তা লিপিবদ্ধ করছিলেন। এমতাবস্থায় হাদীসগুলোও যদি লিপিবদ্ধ করা হতো-তাহলে কুরআন ও হাদীস উভয়টি মিশ্রিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল এবং পরবর্তীতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা খুব কঠিন হতো এবং সমস্যার সৃষ্টি হতো।

www.sunnibarta.com

পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণ সংকলন হয়ে যাওয়ার পর মূলত: হাদিস সংকলনের কর্মসূচী শুরু হয়। নবীজির পবিত্র বাণী - بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (আমার পক্ষ হতে একটি বাণী হলেও তোমরা অন্যজনের কাছে পৌঁছিয়ে দাও)- এই নির্দেশের বাস্তবায়নে একদল লোক এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের নাম "মুহাদ্দিস"। তাঁরা অত্যন্ত সুক্ষ্ম নজরে যাঁচাই-বাঁছাই করে হাদীস সংকলন করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হাদীস সমূহ উপস্থাপনের গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নবীজির ছাত্র এবং নবীজি তাঁদের মুয়াল্লিম বা শিক্ষাগুরু। পবিত্র কুরাআনে ইরশাদ হয়েছে -

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ-وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ-

অর্থাৎ-"আল্লাহ্ সেই সত্ত্বা, যিনি উম্মী লোকদের জন্য তাদের মধ্য হতে একজন মহান রাসূল প্রেরণ করেছেন- যিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন- যদিও ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল। অধিকন্তু- তিনি পরবর্তী লোকদের জন্যও- যারা এখনো পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়নি। (সূরা জুম'আ আয়াত - ২০৩)

আয়াতের মর্মার্থ হলো-নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমসাময়িক এবং পরবর্তীদের জন্য তথা সকলের জন্যই শিক্ষাগুরু। তিনি পবিত্র কুরআনের মর্মার্থ ও নির্দেশনা সাহাবায়ে কেরামের সামনে উপস্থাপন করতেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে -

وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"আপনার প্রতি জিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যেন ঐসব বিষয় (মর্ম) আপনি মানুষের কাছে প্রকাশ করেন- যা তাদের জন্য প্রেরিত হয়েছে। (সূরা নাহল আয়াত- ৪৪)

আয়াতে করিমা হতে স্পষ্ট বুঝা গেল, নবীজির দায়িত্ব পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করা। আর উম্মতের দায়িত্ব হলো সে সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভালভাবে শুনে বুঝে তা যথাযথ সংরক্ষণ ও বাস্তাবায়ন করা এবং এটা মহান আল্লাহ্র নির্দেশও বটে- أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রাসূলেরও আনুগত্য করো)।

বলা বাহুল্য- পবিত্র কুরআনে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। আর তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিবরণ রয়েছে হাদীসে। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচী,ফরয,ওয়াজিব ইত্যাদির বিধি-বিধান, হজ্বের নিয়মাবলী। তাছাড়া মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক,ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ নবীজি দিয়েছেন হাদীস শরীফের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে এসেছে - أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো)। কিন্তু সেই নামাযের কাঠামো পদ্ধতি সব কিছু বিবরণ কুরআনে নেই; রয়েছে হাদীসে। সুতরাং এক কথায় বলতে হয়- আমাদের জীবনের বিরাট অংশ নির্ভর করছে পবিত্র হাদীসের উপর। আর সেই হাদীস সমূহ যাদের বর্ণনা, লিখনী-ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, আমরা তাঁদের কাছে চিরঋণী। তাঁরা হলেন হাদীস সংকলনের মহান দিকপাল। যুগে যুগে মুসলিম প্রজন্মের হৃদয়ে তাঁদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় ও বরণীয়। লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্য হতে তাঁরা নির্বাচিত। ইসলামী জ্ঞান সমুদ্রের তলদেশ হতে অমূল্য রত্ন আহরণকারী যে সব বীর ডুবুরী মনিষি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লক্ষ-লক্ষ হাদীস একত্রিত করে পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - মাযহাবের ইমাম ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম তিরমিযি(র.), ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে মাজাহ প্রমুখ। তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন হাদীস শরীফ সংকলনের খিদমতে-উপহার দিয়েছেন মুসলিম মিল্লাতকে লক্ষ-লক্ষ হাদীস। তাঁদের জন্যই বিশেষভাবে দোয়া করেছেন দো-জাহানের নবী-যা বক্ষ্যমান হাদীসের ভাষ্য থেকে প্রমানিত।

হাদীস সংগ্রহ, প্রচার-প্রসার, সংরক্ষণ, সংকলন কর্ম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এতই গ্রহণযোগ্য ছিল যে, যারা এ কাজ করতেন-হাদীস

www.sunnibarta.com

মুখস্ত করতেন- তাদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতেন এবং তাঁদের জন্য খাসভাবে দোয়া করতেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আবু হোরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবীর স্মরণশক্তি মেধাশক্তির জন্য নবীজির দোয়ার কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ইতিহাসের পাতায়।

নবীজির মকবুল দোয়ার ফলে ইলমে হাদীসের খিদমতকারী মুহাদ্দিসগণ হয়েছেন বিশ্বনন্দিত ও সর্বজন সমাদৃত। পারলৌকিক সফলতা তো আছেই দুনিয়ার বুকেই আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টান্ত অনেক। যেমন-

ইমাম বুখারী (র.) - বোখরী শরীফ সংকলনের সময় প্রতিটি হাদীস লিপিবন্ধ করার প্রাককালে নুর নবীজির সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। কারণ, প্রতিটি হাদীস সংগ্রহ করেই দু'রাকাত নফল নামায পড়ে -মোরাকাবা করে হাদীসখানা সহীহ কিনা-এ বিষয়ে সরাসরি নবীজির পক্ষ হতে ইঙ্গিত পেয়েই তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। সুতরাং তিনি সহীহ বুখারীতে যত সংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন- ততোবার নবীজির দীদার লাভ করেছেন। একজন ঈমানদারের জন্য নবীজির নূরানী সাক্ষাত (দীদার) লাভের চাইতে বড় নিয়ামত আর কী হতে পারে? তাইতো ইমাম বুখারীর (রহ.) ইন্‌তেকালের পর তাঁর মাযারের মাটি হতে মেশক আম্বারের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে; যা তাদের হাদীসের খিদমত মহান আল্লাহ ও রাসূলের দরবারে কবুল হওয়ার স্বাক্ষর বহন করে। বর্তমানে আমরা অতি সহজে নবীজির যে সমস্ত হাদীস পেয়ে যাচ্ছি- তা কিন্তু একদিনে সংকলিত হয়নি। এর পেছনে রয়েছে এক ঝাঁক নিরলস সংগ্রামী পুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রম। তাঁরা এক একটা হাদীস সংগ্রহের জন্য সুদূর কুফা, বসরা, নিশাপুর, হিজায, খোরাসান-প্রভৃতি এলাকা ভ্রমণ করতেন। তাঁরা দুনিয়ার সব কাজ বাদ দিয়ে একমাত্র হাদীস সংগ্রহের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই খেদমতের বিনিময়ে তাঁরা ছিলেন নবীজির যোগ্য ওয়ারিশ। তাঁদের সুপারিশে পার হবে শতকোটি গুনাহ্‌গার (আল হাদীস)।

হযরত ওমর বিন আবি সালমা ইমাম আওযায়ীর কাছে হাদীস শুনতে গিয়ে দীর্ঘ চার বৎসর তাঁর সান্নিধ্যে কালাতিপাত করে মাত্র ত্রিশখানা হাদীস শুনতে পান এবং তা অতি যত্নসহকারে সংকলন করেন। আর হতাশার সুরে বললেন - আমি আপনার খিদমতে দীর্ঘ চার বৎসর কাল অতিবাহিত করলাম- অথচ মাত্র ত্রিশটি হাদীস সংগ্রহ করতে পারলাম। জবাবে ইমাম আওযায়ী বললেন- তুমি চার বৎসরে ত্রিশখানা হাদীস সংগ্রহ করা কি কম মনে করেছ? অথচ তুমি কি জান যে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য সূদূর মিশর সফর করেছিলেন- আর সেই সফরের জন্য একটি বাহন (জানোয়ার) ক্রয় করে তার উপর আরোহন করেই মিশর গিয়ে হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) এর সাথে সাক্ষাত করে ঐ একটি মাত্র হাদীস সংগ্রহ করে পূনরায় মদীনা শরীফ ফিরে এসেছিলেন? সেক্ষেত্রে মাত্র চার বৎসর সময়ে একই জায়গায় বসে তুমি ত্রিশখানা মুল্যবান হাদীস সংগ্রহ করতে পারা চারটিখানি কথা নয়।

সম্মানিত পাঠক! বুঝতেই পেরেছেন- পূর্ববর্তী যুগের ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাদের কষ্ট,শ্রম,মেধা,সম্পদ সবকিছু দিয়েই তাঁরা ইলমে হাদীসের খিদমত করেছেন- আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য হাদীস। বর্তমান সময়েও যারা হাদীসের পাঠদান, প্রচার ও প্রকাশনার কাজে লিপ্ত-তাঁরাও নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।

আসুন! আমরা মানুষের কাছে নবীজির পবিত্র হাদীস সমূহ সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক আমাদের সহায় হোন। আমিন!

www.sunnibarta.com

তারাবীহ'র নামায বিশ রাক্'আত; আট রাকাত নয়

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সমগ্র উম্মত এ কথার উপর একমত যে, 'তারাবীহ'র নামায আট রাক্'আত নয়।' বাকী রইলো- এ নামায কি বিশ্ রাক্'আত, না আরো বেশী! অধিকাংশ (প্রায় সব) মুসলমান বিশ রাক্'আত পড়েন, কেউ কেউ চল্লিশ রাক্'আত পড়েন। গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী তথা ওহাবী) হচ্ছে ওই ফির্ক্বা বা দল, যাদের নিকট নামায ভারী ও কষ্টকর। নিছক নাফসের উপর বোঝা মনে করে 'তারাবীহ্' শুধু আট রাক্'আত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তাদের পক্ষে কিছু সংখ্যক বর্ণনাকে বাহানা-অজুহাত সাব্যস্ত করে। এ জন্য আমি এ মাসআলাকে দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করবো। প্রথম পরিচ্ছেদে বিশ্ রাক্'আত তারাবীহর পক্ষে প্রমাণাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওহাবী-লা-মাযহাবীদের আপত্তিগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর জবাব (খন্ডন) উল্লেখ করবো। আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন! আ-মী-ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিশ রাক্'আতারাবীহ্ প্রমাণাদি বিশ রাক'আত তারাবীহ্ পড়া- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও আম মুসলমানদের সুন্নাত। আট রাক'আত তারাবীহ্ সুন্নাতের পরিপন্থী। দলীলাদি নিম্নরূপ:

হাদীস নম্বর ১-৫

ইবনে আবী শায়বাহ্ ও তাবরানী 'কবীর'-এ, বায়হাক্বী, আবদ্ ইবনে হুমায়দ এবং ইমাম বাগাভী সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ وَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাক্'আত পড়তেন- ব্যতীত। ইমাম বায়হাক্বী এতটুকু বেশী লিখেছেন- জামা'আত ব্যতীত তারাবীহ্ পড়তেন। এ হাদীস শরীফগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, খোদ্ হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ রাক্'আত তারাবীহ্ পড়তেন। যেসব রেওয়য়তে এসেছে যে, তিনি শুধু তিন দিন তারাবীহ্ পড়েছেন, সেগুলোতে জমা'আত সহকারে পড়া বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জমা'আত ব্যতীত তো সব সময় পড়তেন, জমা'আত সহকারে শুধু তিনদিন পড়েছেন। সুতরাং হাদীস শরীফগুলোতে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। এও বুঝা গেলো যে, তারাবীহ্ 'সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ 'আলাল আয়ন'। (অর্থাৎ শরিয়তের বিধানাবলী বর্তায় এমন প্রত্যেকের জন্য তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্') কারণ, হুযূর-ই এ নামায সব সময় পড়েছেন এবং লোকজনকে উৎসাহ্ও দিয়েছেন।

হাদীস নম্বর-৬

ইমাম মালিক হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فِىْ رَمَضَانَ بِثَلٰثٍ وَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থ: হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যামানায় রমযানে লোকেরা তেইশ রাক্'আত নামায পড়তেন। এ থেকে দু'টি মাস্আলা প্রতীয়মান হয়ঃ এক. তারাবীহ্ বিশ রাক্'আত এবং দুই. বিতর তিন রাক্'আত। এ কারণে সর্বমোট তেইশ রাক্'আত হয়েছে।

হাদীস নম্বর-৭

ইবনে মুনী' হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَمَرَه اَنْ تُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ فِىْ رَمَضَانَ ـ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ وَلَا يُحْسِنُوْنَ اَنْ يَّقْرَؤُا فَلَوْقَرَأْتَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا شَىْءٌ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ فَقَدْ عَلِمْتُ وَلٰكِنَّه حَسَنٌ فَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً -

www.sunnibarta.com

অর্থ: হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ''তুমি লোকজনকে রমযানের রাতে তারাবীহর নামায পড়াবে। কেননা, লোকেরা দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং ক্বোরআন করীম উত্তমরূপে পড়তে পারে না। সুতরাং উত্তম হবে যদি তুমি তাদেরকে রাতে ক্বোরআন পড়ে শুনাও।'' হযরত উবাই আরয করলেন, ''হে আমীরুল মু'মিনীন, এটা ওই কাজ, যা ইতোপূর্বে ছিলো না।'' তিনি বললেন, ''আমি জানি; কিন্তু এটা উত্তম কাজ। সুতরাং হযরত উবাই তাঁদেরকে বিশ রাক্'আত পড়িয়েছেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটা মাসআলা প্রতীয়মান হয়- এক. হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতের পূর্ব থেকে মুসলমানদের মধ্যে তারাবীহ্ জারী ছিলো; তবে জমা'আত সহকারে, গুরুত্বের সাথে সব সময় (নিয়মিতভাবে) তারাবীহর নামায পড়ার প্রচলন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যমানা থেকে হয়েছে। মূল তারাবীহ্ সুন্নাতে রসূল। আর জমা'আত, গুরুত্ব দেওয়া ও নিয়মিতভাবে পড়া- সুন্নাত-ই ফারূক্বী। (হযরত ওমর ফারূক্বের সুন্নাত।)

দুই. বিশ রাক্'আত তারাবীহর উপর সমস্ত সাহাবীর ইজমা' (ঐকমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, হযরত উবাই ইবনে কা'ব সমস্ত সাহাবীকে বিশ্ রাক্'আত পড়িয়েছেন। সাহাবা-ই কেরামও পড়েছেন। কেউ আপত্তি করেননি।

তিন. 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ্'আত) ভাল জিনিস। হযরত উবাই ইবনে কা'ব আরয করেছেন, তারাবীহ্র নামায জামা'আত সহকারে নিয়মিতভাবে গুরুত্ব সহকারে পড়াতো ইতোপূর্বে ছিলোনা, বিদ্'আত। হযরত ফারূক্বে আ'যম বলেছেন, একেবারে ঠিক কথা, বাস্তবিকই এটা বিদ্'আত; কিন্তু উত্তম।

চার. যে কাজ হুযূর-ই আক্রামের যমানায় ছিলোনা, তা বিদ্'আত; যদিও সাহাবীদের যুগে প্রচলিত হয়। যেমন- তারাবীহর নামায জমা'আত সহকারে আদায় করা। এটা যদিও হযরত ওমর ফারূক্বের যুগে প্রচলিত হয়েছে; কিন্তু সেটাকে 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ্'আত) বলা হয়েছে।

হাদীস নম্বর-৯

ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হযরত আবূ আবদুর রহমান সালামী থেকে বর্ণনা করেছেন-

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ دَعَا الْقُرَّاءَ فِىْ رَمَضَانَ وَأَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَكَانَ عَلِىٌّ يُوْتِرُ بِهِمْ

অর্থ: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রমযান শরীফে ক্বারীদেরকে ডাকলেন, তারপর একজনকে নির্দেশ দিলেন যেন পাঁচ তারাবীহ বিশ রাক'আত নামায পড়ান। হযরত আলী তাদেরকে বিতর পড়াতেন।

হাদীস নম্বর-১০

ইমাম বায়হাক্বী হযরত আবুল হাসানা থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থ: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি পাঁচ তারাবীহ্ অর্থাৎ বিশ রাক'আত নামায পড়ান।

নমুনাস্বরূপ কয়েকটা হাদীস এখানে পেশ করা হলো। অন্যথায় বিশ্ রাক্'আতের পক্ষে হাদীস শরীফ অনেক রয়েছে। আগ্রহ থাকলে হাকীমুল উম্মাহ্ মুফতী আহমদ ইয়ার খান আলায়হির লিখিত 'লুম্'আতুল মাসাবীহ্ ফী রাক্'আ-তিৎ তারাবীহ্' এবং 'সহীহুল বিহারী' পাঠ-পর্যালোচনা করতে পারেন।

বিবেক বা যুক্তিরও দাবী হচ্ছে তারাবীহর নামায বিশ রাক্'আত, আট রাক্'আত নয়। এরও কয়েকটা কারণ আছে-

এক. দিন ও রাতে ফরয ও ওয়াজিব নামায বিশ্ রাক্'আতঃ সতের রাক্'আত ফরয আর তিন রাক্'আত বিতর ওয়াজিব। রমযান মাসে বিশ রাক্'আত তারাবীহ্ পড়া হলে ওই বিশ রাক্'আত ফরয ও ওয়াজিব নামায পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে এবং ওইগুলোর মর্যাদা বা গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যাবে। (কারণ, এ সুন্নাত

নামাযগুলো ফরয ও ওয়াজিব নামাযগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার করবে, কাফফারাহ্ হয়ে যাবে।) সুতরাং আট রাক্‘আত তারাবীহ্, ক্বিয়াস তথা যুক্তিরও বিরোধী।

দুই. সাহাবীগণ আলাইহিমুর রিদ্বওয়ান তারাবীহর প্রত্যেক রাক্‘আতে এক রুকূ’ পরিমাণ ক্বোরআন পড়তেন; বরং ক্বোরআন-ই করীমের রুকূ’কে রুকূ’ এজন্য বলা হয় যে, এতটুকু আয়াত পড়ে হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও অন্যান্য সাহাবীগণ তারাভীতে রুকূ’ করতেন। আর ২৭ রমযানের রাতে ক্বোরআন খতম হতো। আট রাক্‘আত হলে ক্বোরআন-ই করীমের রুকূ’ সংখ্যা সর্বমোট ২১৬ হতো; অথচ ক্বোরআন-ই করীমের রুকূ’র সংখ্যা সর্বমোট ৫৫৭। বিশ রাক্‘আতের হিসেবে ৫৪০ রুকূ’ হয়। কোন ওহাবী আট রাক্‘আত তারাবীহ্ মানলে ক্বোরআন করীমের রুকূ’গুলোর এ সংখ্যা দাঁড়ানোর কারণটুকুও বলে দেবেন।

তিন. ‘তারাবীহ্’ (تراويح) হচ্ছে ‘তারভীহাহ্’ (ترويحه)-এর বহু বচন। ‘তারাভীহাহ্’ বলে প্রত্যেক চার রাক্‘আতের পর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়াকে। যদি তারাবীহ্ আট রাক্‘আত হতো, তাহলে মধ্যভাগে শুধু একবার বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ হতো। এমতাবস্থায় এর নাম তারাবীহ্ (বহুবচন) হতো না। ‘বহুবচন’ আরবীতে কমপক্ষে ‘তিন’কে বলা হয়।

উম্মতের আলিমদের আমল সবসময় প্রায়সব উম্মতের আমল বিশ্ রাক্‘আত তারাবীহ্ পড়াই চলে আসছে। এখনো এ আমল বলবৎ রয়েছে। হেরমাঈন শরীফাঈন ও সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানগণ বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ই পড়ে থাকেন। সুতরাং তিরমিযী শরীফের রমযান মাসে ‘রাত জাগরণ করে ইবাদত করার বিবরণ’ শীর্ষক অধ্যায়ে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى مَارُوِىَ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ هٰكَذَا اَدْرَكْتُ بَلَدَ مَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থ: এবং অধিকাংশ আলিমের আমলের উপরই যা হযরত ওমর, হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম থেকে বর্ণিত। অর্থাৎ বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ আর এটাই হযরত সুফিয়ান সওরী, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফে‘ঈ আলায়হিমুর রাহমাহর অভিমত। ইমাম শাফে‘ঈ বলেছেন, আমি মক্কাবাসীদেরকে বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ পড়তে দেখতে পেয়েছি। ওমদাতুল ক্বারী শরহে বোখারী’: ৫ম খন্ড: ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جَمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ وَالشَّافِعِىُّ وَاَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ

অর্থ: ইবনে আবদুল বার বলেন, বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ই প্রায় সব বিজ্ঞ আলিমের কথা। এটাই কূফী হযরত গণ, ইমাম শাফে‘ঈ এবং অধিকাংশ আলিম ও ফক্বীহগণের অভিমত। বস্তুত এটাই বিশুদ্ধ কথা। এটা হযরত উবাই ইবনে কা’ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত। এ’তে সাহাবীগণের কোন বিরোধ নেই।

মাওলানা আলী ক্বারী ‘শরহে ভিক্বায়াহ্’য় বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ সম্পর্কে বলেন-

فَصَارَ اِجْمَاعًا لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ عِشْرِيْنَ

অর্থ: বিশ রাক্‘আত তারাবীহর উপর মুসলমানদের ইজমা’ (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, বায়হাক্বী সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবা-ই কেরাম ও সমস্ত মুসলমান হযরত ওমর, ওসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমের যমানায় বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ পড়তেন।

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী বলেছেন-

اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلٰى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থ: সমস্ত সাহাবী এ কথার উপর একমত যে, তারাবীহ্ বিশ রাক্‘আত।

www.sunnibarta.com

উপরিউক্ত বরাতগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। বিশ রাক্‌'আত তারাবীহর উপর সাহাবা-ই কেরামের ইজমা' হয়েছে। বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্ পড়া আম মুসলমানদের আমল। বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্ হারামাঈন শরীফাঈনে পড়া হয়। বিশ্ রাক্‌'আত তারাবীহ্ বিবেক ও যুক্তির অনুরূপ। বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্ ক্বোরআনের রুকূ'গুলোর সংখ্যানুরূপ; বরং আজকাল হারামাঈন-ই ত্বাইয়্যেবাঈনে নজদীদের বাদশাহী চলছে; কিন্তু এখনো ওখানে বিশ্ রাক্‌'আত তারাবীহ্ পড়া হয়। কারো ইচ্ছা হলে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসতে পারেন। জানিনা, আমাদের এখানকার ওহাবী লা-মাযহাবীরা কার অনুসরণ করে, যারা আট রাক্‌'আত তারাবীহ্ পড়ে। আট রাক্‌'আত তারাবীহ্ তো সুন্নাতে রসূলের বিরোধী, সুন্নাতে সাহাবার পরিপন্থী, মুসলমানদের সুন্নাতের বরখেলাফ। ওলামা-মুজতাহিদীনের বিপরীত; এমনকি ওটা হারামাঈন-ই ত্বাইয়্যেবাইনেরও বিরোধী; অবশ্য মনের কুপ্রবৃত্তির অনুরূপ। কারণ, নামায নাফেস আম্মারার উপর বোঝা স্বরূপ। মহান রব নাফসে আম্মারার ফাঁদগুলো থেকে মুক্ত করে সুন্নাতে রসূলের উপর আমল করার তাওফীক দিন। আ-মী-ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বিশ্ রাক্‌'আত তারাবীহর বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খণ্ডন বাস্তব কথা হচ্ছে- লা-মাযহাবী আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নিকট আট রাক্‌'আত তারাবীহর পক্ষে কোন মজবুত দলীল নেই; আছে কিছু অহেতুক ভ্রম আর কিছু অমূলক সন্দেহ। ইচ্ছে হচ্ছে না ওইগুলো খণ্ডন করতে, কিন্তু বিষয়টির আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন আরয করার প্রয়াস পাচ্ছি। মহামহিম রব তাদেরকে হিদায়ত নসীব করুন!

আপত্তি-১.

ইমাম মালিক সা-ইব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّه قَالَ اَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اُبَیَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمَ الدَّارِیَّ اَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِاِحْدٰی عَشْرَةَ رَكْعَةً ...الخ

অর্থ: তিনি বলেন, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উবাই ইবনে কা'ব ও তামীমে দারীকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা লোকদেরকে এগার রাক্‌'আত নামায পড়িয়ে দেন।...

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত ফারূক্ব-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আট রাক্‌'আত তারাবীহ্ পড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তারাবীহ্ বিশ রাক্‌'আত হতো তাহলে বিতরসহ সর্বমোট ২৩ রাক্‌'আত হতো।

খন্ডন এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়- এক. এ হাদীস, হে আহলে হাদীস, তোমাদেরও ঘোর বিরোধী। কেননা, এ থেকে যেখানে আট রাক্‌'আত তারাবীহ্ প্রমাণিত হলো বলে তোমরা দাবী করছো, ওখানে তিন রাক্‌'আত বিত্র নামাযের প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। তখনই তো সর্বমোট এগার রাক্‌'আত হবে, আট রাক্‌'আত ও তিন রাক্‌'আত বিতর। যদি বিতর নামায এক রাক্‌'আত হতো, তবে সর্বমোট নয় রাক্‌'আত হয়, এগার রাক্‌'আত হয় না। বলো, তোমরা এক রাক্‌'আত বিত্র কেন পড়ো? তোমরা এক হাদীসের একাংশ মেনে নিচ্ছো, আরেকাংশকে অস্বীকার করছো? সুতরাং এ রেওয়াতের তোমরা যে জবাব দেবে ওই জবাব আমাদেরও হবে।

দুই. এ হাদীসের রাভী (বর্ণনাকারী) মুহাম্মদ ইবনে ইয়ূসুফ। তার বর্ণনাদিতে তুমুল গড়মিল ও ভিন্নতা রয়েছে। মুআত্তা-ই ইমাম মালিকে এ বর্ণনায় তো তাঁর নিকট এগার রাক্‌'আতের উদ্ধৃতি রয়েছে, আর মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারভেযী তার নিকট থেকে তের রাক'আত বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আবদুর রায্যাক্ব তাঁরই থেকে একুশ রাক্‌'আত বর্ণনা করেছেন। দেখুন, ফাৎহুল বিহারী শরহে বোখারী: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ১৮, খায়রিয়া প্রেস, মিশর থেকে মুদ্রিত। সুতরাং তার কোন বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য নয়। আশ্চর্য! তোমরা কি নাফসে আম্মারার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য এমন সব অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার আশ্রয় নিচ্ছো?

www.sunnibarta.com

তিন. হযরত ওমর ফারূক্বের যুগে প্রাথমিক পর্যায়ে আট রাক্‌'আত তারাবীহর হুকুম দেওয়া হয়েছিলো। তারপর বার রাক্‌'আতের, সর্বশেষ বিশ রাক্‌'আতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এটা সব সময়ের জন্য বহাল হলো। সুতরাং এ-ই 'মুআত্তা-ই ইমাম মালিক'-এ হযরত আ'রাজ থেকে এক দীর্ঘ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেন, যার সর্বশেষ শব্দাবলী নিম্নরূপ:

وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ ثَمَانِ رَكْعَاتٍ فَإِذَا اَقَامَهَا فِيْ اِثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَاَى النَّاسُ اَنَّه قَدْ خُفِّفَ

অর্থ: ক্বারী আট রাক্‌'আত তারাবীহতে সূরা বাক্বারা পড়তেন। অতঃপর যখন বার রাক্‌'আতে তা পড়তে লাগলেন, তখন লোকেরা অনুভব করলো যে, তাদের উপর সহজ করা হয়েছে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা আলী ক্বারী তাঁর 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত'-এ বলেন-

ثَبَتَ الْعِشْرُوْنَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ وَفِى الْمُوَطَّا رِوَايَةٌ بِاحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا اَنَّه وَقَعَ اَوَّلاً ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْاَمْرُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ فَاِنَّه الْمُتَوَارِثُ

অর্থ: অবশ্য বিশ্ রাক্‌'আতের হুকুম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যামানায় প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়েছে। মু'আত্তা শরীফে এগার রাক্‌'আতের উল্লেখ রয়েছে। এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে করা হয়েছে যে, হযরত ওমর ফারূক্বের খিলাফতকালে প্রথমে আট রাক্‌'আতের হুকুম ছিলো। তারপর বিশ রাক্‌'আত তারাবীহর উপর স্থির হলো। এটাই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হলো।

বুঝা গেলো যে, আট রাক্‌'আত তারাবীহর উপর আমল বর্জন করা হয়েছে। বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্ সাহাবা-ই কেরাম ও সমস্ত মুসলমানের মধ্যে কার্যকর রয়েছে।

আপত্তি-২

হে আহলে সুন্নাত! আপনাদের পেশকৃত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হলো যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্ পড়তেন। সুতরাং হযরত ওমর প্রথমে আট রাক্‌'আতের হুকুমই বা কেন দিলেন? সুন্নাতের পরিপন্থী হুকুম দেওয়া সাহাবা-ই কেরামের শান থেকে বহু দূরে। (অর্থাৎ অসম্ভবই।)

খন্ডন

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে তো বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্ পড়েছেন। কিন্তু সাহাবীদেরকে এ সংখ্যার স্পষ্ট নির্দেশ দেননি। শুধু রমযানের রাতগুলোতে বিশেষ নামাযের প্রতি উৎসাহ্ দিয়েছেন; বরং খোদ্ জমা'আতসহকারে, নিয়মানুসারে, সবসময় করাননি। এর কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, তারাবীহ্ ফরয হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য সাহাবা-ই কেরামের সামনে তারাবীহর রাক্‌'আতগুলোর সংখ্যা প্রকাশ পায়নি।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রাথমিক পর্যায়ে নিজের ইজতিহাদ দ্বারা আট রাক্‌'আত, বার রাক্‌'আত নির্দ্ধারণ করেছেন। বিশ রাক্‌'আতের সূত্র পাওয়া মাত্রই বিশ রাক্‌'আতেরই স্থায়ী হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন। ওই যুগে আজকালের মতো হাদীস শরীফগুলো কিতাবগুলোতে সংকলন করা হয়নি। একেকটা হাদীস অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে অর্জন করা যেতো।

আপত্তি-৩.

বোখারী শরীফে আছে- হযরত আবূ সালমাহ্ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানের রাতগুলোতে কত রাক্‌'আত পড়তেন। তখন উম্মুল মু'মিনীন বললেন-

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِه عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَ رَكْعَاتٍ

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযান ও গর রমযানে এগার রাক্‌'আতের বেশি পড়তেন না।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আক্রাম তারাবীহ্ আট রাক্‌'আত পড়তেন। যদি বিশ রাক্‌'আত পড়তেন, তাহলে ২৩ রাক্‌'আতহয়ে যেতো।

খন্ডন এ আপত্তির ও কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস আপত্তিকারীদেরও বিপরীত। কারণ, যদি এটা থেকে আট রাক্'আত তারাবীহ্ প্রমাণিত হয়, তাহলে তিন রাক 'আত বিতরও প্রমাণিত হয়। তখনই তো সর্বমোট এগার রাক্'আত হয়। আপনারা বিতর এক রাক্'আত পড়েন কেন জবাব দিন। আপনারা কী হাদীসের একাংশের উপর ঈমান রাখছেন, আর বাকী অংশকে অস্বীকার করছেন?

দুই. হযরত উম্মুল মু'মিনীন এখানে তাহাজ্জুদের নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন, তারাবীহর নামাযের নয়। এ কারণে তিনি এরশাদ করেছেন, রমযান ও গর রমযানে, অন্যান্য মাসে এগার রাক্'আতের বেশি পড়তেন না। রমযান ছাড়া গর রমযানে কোন্ মাসে তারাবীহ্ পড়া হয়? যদি আপনারা একথায় গভীরভাবে চিন্তা করে নিতেন, তাহলে এ আপত্তির দুঃসাহস করতেন না। এ কারণে তিরমিযী শরীফে এ হাদীসকে, 'রাতের নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের বিবরণ' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, এ হাদীসেরই শেষভাগে আছে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বিতরের পূর্বে কেন শু'য়ে পড়েন? তিনি এর জবাবে বলেন, 'হে আয়েশা, আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, হৃদয় ঘুমায় না। এ থেকে বুঝা গেলো যে, এ নামায হুযূর-ই আক্রাম শেষ রাতে ঘুম থেকে ওঠে সম্পন্ন করতেন। তারাবীহ্ শয়ন করার পর পড়া হয় না, তাহাজ্জুদ পড়া হয়।

তিন. যদি এ নামায মানে তারাবীহর নামায হয়, আর হুযূর-ই আক্রাম আট রাক্'আত তারাবীহ্ পড়তেন, তাহলে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশ রাক'আত তারাবীহর হুকুম কেন দিলেন? আর সমস্ত সাহাবীও কোন এ হুকুম মেনে নিলেন? হযরত উম্মুল মু'মিনীনও এসব কিছু দেখে কেন ঘোষণা করলেন না যে, 'আমি হুযূর-ই আন্ওয়ারকে আট রাক্'আত তারাবীহ্ পড়তে দেখেছি, তোমরা কেন বিশ্ রাক্'আত পড়ছো? এটা তো সুন্নাতের পরিপন্থী, বিদ'আতে সাইয়্যেহ্!' তিনি কেন নিশ্চুপ রইলেন? একটু হুঁশে আসুন, হাদীস শরীফের সঠিক অর্থ বুঝার ছেষ্টা করুন।ওহাবী-লা মাযহাবীদের প্রতি কতিপয় প্রশ্ন সমগ্র দুনিয়ার ওহাবীদের প্রতি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করা হলো, সবাই মিলে সেগুলোর জবাব দিন! বলোতো-

এক. হযরত ওমর, ওসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বিশ্ রাক্'আত পড়ার হুকুম কেন দিলেন? তাঁদের কি এ সুন্নাতের খবর ছিলোনা? আজ চৌদ্দ শতাধিক বছর পর আপনারা জানতে পারলেন?

দুই. যদি না'উযুবিল্লাহ্, খোলাফা-ই রাশেদীন বিদ্'আত-ই সাইয়্যেহ্র নির্দেশ দেন, তাহলে সমস্ত সাহাবী বিনা প্রতিবাদে কেন তা কবূল করে নিলেন? তাঁদের মধ্যে কি কেউ সত্য কথা বলার ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন না? আজ এতকাল পর আপনারা সত্যবাদী পয়দা হয়ে গেলেন এবং সুন্নাতের অনুসারীও?

তিন. যদি সমস্ত সাহাবীও নিশ্চুপ থাকেন, তবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একটা সুন্নাতে রসূলের বিপরীত বিদ্'আত-ই সাইয়্যেহ্র প্রচলন হতে দেখে তিনি কেন নিশ্চুপ রইলেন? তাঁর উপর সত্যের প্রচার ফরয ছিলো কিনা? যেমন আপনারা আজকাল আট রাক'আত তারাবীহর জন্য ওঠে পড়ে লেগেছেন, মৌখিক, আন্তরিক, দৈহিক ও আর্থিকভাবে জোর দিচ্ছেন, তিনি তেমনটি করলেন না কেন? তাহলে তো আপনারা হযরত উম্মুল মু'মিনীন থেকেও উত্তম হয়ে গেলেন?

চার. হে লা-মাযহাবী-ওহাবীরা বলুন, ওইসব খোলাফা-ই রাশেদীন এবং সমস্ত সাহাবী, বরং খোদ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ওয়া আনহুম বিশ রাক'আত তারাবীহ্ পড়ে, পড়িয়ে কিংবা জারী হতে দেখে নিশ্চুপ র'য়ে কি হিদায়তের উপর ছিলেন, নাকি, না'উযুবিল্লাহ্, পথভ্রষ্টতার উপর ছিলেন? যদি আজ হানাফীগণ বিশ রাক্'আত তারাবীহ্ পড়ার

www.sunnibarta.com

ভিত্তিতে গোমরাহী ও বিদ্‌'আতী হন, তাহলে ওইসব হযরতের উপর আপনাদের ফাৎওয়া কি? জবাব দিন!

পাঁচ. যদি বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্ বিদ্‌'আতে সাইয়্যোহ্ হয়, আর আট রাক্‌'আত তারাবীহ্ হয় সুন্নাত এবং আপনারা বাহাদুরগণ আজ চৌদ্দশতাধিক কাল পরে এসে এ সুন্নাত জারী করে থাকেন, তাহলে বলুন, হেরমাঈন তাইয়্যেবাঈনের সমস্ত মুসলমান, আপনাদের ফাৎওয়া অনুসারে বিদ্‌'আতী ও গোমরাহ্ কিনা? আর যদি না হয় তবে কেন? যদি হন, তাহলে আপনারা আজ নজদী ওহাবীদেরকে এর তাবলীগ কেন করছেন না? আপনাদের ফাৎওয়া কি শুধু পাক-বাংলা-ভারতে ফ্যাসাদ ছড়ানোর জন্যই।

ছয়. সম্মানিত মুজতাহিদ ইমামগণ এবং তাদের সমস্ত অনুসারী, যাঁদের মধ্যে লাখো আউলিয়া, ওলামা, মুহাদ্দিস-ফোক্বাহ, মুফাসিসরীন রয়েছেন, যাঁরা সবাই বিশ্ রাক্‌'আত তারাবীহ্ পড়তেন, তাঁরা কি সবাই বিদ্‌'আতী ও গোমরাহ্ ছিলেন?

সাত. যদি এসব হযরত গোমরাহ হন, আর হিদায়তের উপর আপনাদের মুষ্ঠি পরিমাণ দলই থাকে, তাহলে ওই সব পথভ্রষ্টের কিতাবাদি থেকে হাদীস নেওয়া, হাদীস পড়া জায়েয, না কি হারাম, আর তাঁদের বর্ণিত হাদীস সহীহ্ কিনা? যখন মন্দ আমল-বিশিষ্ট লোকের বর্ণিত হাদীস সহীহ্ হয় না, তবে মন্দ আক্বীদা সম্পন্নের হাদীস সহীহ্ কিভাবে হতে পারে?

আট. দুনিয়ার মুসলমান, যাঁরা বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্ পড়েন, আপনাদের ফাৎওয়া অনুসারে গোমরাহ্ ও বিদ্‌'আতী কিনা? যদি তেমনি হয়, তাহলে এ হাদীসের মর্মার্থ কি? اِتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ অর্থাৎ মুসলমানদের বড় দলের অনুসরণ করো! আর ক্বোরআন-ই করীমে তো আম মুসলমানদেরকে 'শ্রেষ্ঠতম উম্মত' ও মানুষের উপর আল্লাহ্‌র সাক্ষী এটা বলেছেন কেন?

আশা করি, লা-মাযহাবী, ওহাবী সম্প্রদায় তাদের নজদ পর্যন্ত অঞ্চলের ওহাবী-আলিমদের সাথে মিলে এসব প্রশ্নের জবাব দেবেন! আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

আমাদের দাবী!

সমগ্র দুনিয়ার ওহাবী-নজদী-লা মাযহাবীদের নিকট আমরা এটা চাই যে, তারা যেন একটি মাত্র সহীহ্, মরফূ' হাদীস, বোখারী, মুসলিম অথবা কমপক্ষে সেহাহ্ সিত্তাহর এমনই হাদীস পেশ করুক, যাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আট রাক্‌'আত তারাবীহ্ পড়তেন কিংবা সেটার নির্দেশ দিতেন; কিন্তু 'তারাবীহ্' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে অথবা সাহাবা-ই কেরাম আট রাক্‌'আত স্থায়ীভাবে পড়েছেন।আর আমরা বলে দিচ্ছি- ক্বিয়ামত পর্যন্ত দেখাতে পারবেন না, আপনারা নিছক জেদের উপর রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য গ্রহণের তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন! বিশ্ রাক্‌'আত তারাবীহর প্রমাণ, আলহামদু লিল্লাহ্, হুযূর-ই আক্রামের আমল শরীফ, সাহাবা-ই কেরামের বাণী ও আমল (কর্ম), আম মুসলমানের আমল বা তরীক্বাহ্ এবং শরিয়তসম্মত ক্বিয়াস বা যুক্তি থেকে পাওয়া যায়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।

মজার ঘটনা!

গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবী যখন কখনো হানাফীদের মধ্যে এসে আটকা পড়ে যায়, তবে তারাবীহ্ বিশ রাক্‌'আত পড়ে নেয়। এটা অনেকবার দেখা গেছে ও যাচ্ছে। বুঝা গেলো যে, তাদের নিজেদের মাযহাবের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস নেই।

www.sunnibarta.com

রমজানের রোযার ফজিলত ও করণীয়

কাজী মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম

'সাওম' আরবী শব্দ,এর অর্থ-বিরত থাকা। 'রোযা' ফার্সি শব্দ, এর অর্থ- উপবাস থাকা। সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার,স্ত্রী সহবাস হতে নিয়ত সহকারে বিরত থাকাকে ফিক্বহে ইসলামীর পরিভাষায় 'সাওম' বা 'রোযা' বলা হয়। রোযা ইসলামের তৃতীয় রুকন। মহান আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণার মাধ্যমে হিযরতের দেড় বছর পর অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীতে শাবান মাসের ১০ তারিখে উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পবিত্র রমজান মাসের রোযা ফরজ করেছেন। সকল সুস্থ, প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবান মুসলিম সমাজের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি,পারস্পরিক সহনশীলতা, সামাজিক শুদ্ধতা অর্জনে এবং পার্থিব লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে আত্মসংযম ও তাক্ওয়া হাসিলে রোযার বিশাল গুরুত্ব ও অবদান রয়েছে। হযরত আদম আলাইহি'স সালাম থেকে এ সাওমের বিধান ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। [দূররে মুখতার,খাযাইনুল ইরফান ও খাযিন]

রমজানের রোযার ফজিলত

রোযার ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন - হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রমজানের রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপরও ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা খোদাভীরু তথা তাক্ওয়াবান হতে পারো। [আল কুরআন সূরাহ বাক্বারাহ, আয়াত -১৮৩]

অফুরন্ত রহমত, বরকত ও ফজিলতে পরিপূর্ণ এই রমজান মাস। এ মাসের রোযা রাখার ফজিলত বর্ণনাতীত। মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যেই রমজান মাসে উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ রমজান মাস পায়, তারই রোযা পালন করা আবশ্যক"। কারণ এতে অশেষ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে। (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত -১৮৬)

হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন শাবান মাসের শেষ দিনে সাহাবাই কেরামের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোকেরা! তোমাদের উপর একটি মহান মুবারক মাস ছায়া ফেলেছে। এ মাসে হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি রাত আছে। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন ভাল কাজ দ্বারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য কামনা করে, সে যেন অন্য মাসে কোন ফরয কাজ করার ন্যায় আমল করল। আর এ মাসে কোন ব্যক্তি যদি একটি ফরজ কাজ করে, সে যেন অন্য সময়ে ৭০টি ফরজ আদায়ের নেকী লাভ করার সমান কাজ করল। এটি হলো সংযমের মাস আর সংযমের ফল হলো জান্নাত। এটি সাম্যের মাস, এমন মাসে যাতে রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (বায়হাকী ও মিশকাত)

বর্ণিত হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, এটি এমন মাস যার প্রথমাংশ রহমত বা দয়া, মধ্যম অংশ মাগফিরাত তথা ক্ষমা এবং শেষাংশ নাযাত বা দোযখ হতে মুক্তি দানের জন্য নির্ধারিত। এ মাস পাপ পংকিলতা পরিহার করার এবং সৎকর্মে নিজেকে নিয়োগ করার মাস। (বায়হাকী ও মিশকাত)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে রমজানের রোযা রাখে, তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে রমজানে ইবাদত করে, তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

শয়তানী ধোঁকা ও কুমন্ত্রণা হতে রমজান শরীফ মানুষকে রক্ষা করে এবং একাগ্রচিত্তে মহান রবের ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। যেমন- হাদীস পাকে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন রমজান মাস আগমন করে, আকাশের

দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অন্য বর্ণনা মতে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়। অন্য এক বর্ণনা মতে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

পার্থিব দোষ-ত্রুটি, পাপ হতে রমজান শরীফ ঈমানদারগণকে পবিত্র করে। মহান রবের দয়া ও বরকত প্রাপ্তির যোগ্য করে তোলে। হাদীস শরীফে এরশাদ হচ্ছে, রমজানের প্রতিরাতে সকাল হওয়া অবধি একজন আহবানকারী ফিরিশতা এ আহবান করেন যে, হে কল্যাণকামীগণ! কামনার ইতি টান এবং তুষ্ট হয়ে যাও। হে মন্দকারী! পাপ হতে বিরত হও এবং উপদেশ গ্রহণ কর। এমন কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? তাকে ক্ষমা করা হবে। এমন কোন তাওবাকারী আছে কি? তার তাওবা কবুল করা হবে। এমন কোন সাহায্যপ্রার্থী আছে কি? তাকে তার প্রার্থিত বিষয় দেওয়া হবে। আর ঈদুল ফিতরের দিন ত্রিশ দিনের সমপরিমাণ পাপীদের ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

রমজানুল মোবারকের আগমন ও এ মাসকে স্বাগত জানানোর লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা সারা বছর ধরে জান্নাতকে সজ্জিত করেন। হাদীস শরীফে এরশাদ হচ্ছে; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় জান্নাত বছরের শুরু হতে আগামী বছর আসা পর্যন্ত সজ্জিত করা হয়, রমজানুল মোবারককে উদ্দেশ্য করে। তিনি আরো বলেন, রমজান শরীফের প্রথম দিনে আরশের তলদেশে জান্নাতের বৃক্ষের পাতায় বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরগণের পাশ দিয়ে হাওয়া প্রবাহিত হয়। অতঃপর তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! তোমার বান্দাগণ হতে এমন বান্দাদের আমাদের জোড়া বানাও যারা আমাদের দেখে এবং আমরা তাদের দেখে পরস্পরের চক্ষু ঠান্ডা হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, বেহেশতে আটটি দরজা রয়েছে,তম্মধ্যে একটির নাম হলো "রাইয়্যান" যা দ্বারা একমাত্র রোযাদারগণ বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বুখারী মুসলিম ও বায়হাকী)

রমজান শরীফের রোযার এতই গুরুত্ব যে, এ মাসের একটি রোযা যুগ যুগ ধরে রোযা রাখার চেয়েও উত্তম। সারা বছর রোযা রাখলেও এ মাসের একটি রোযার সমান হবেনা।

হাদীস শরীফে এরশাদ হচ্ছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোন শরয়ী অনুমোদন ছাড়া বা রোগ ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি পবিত্র রমজান মাসের একটি রোযাও ভেঙ্গে ফেলে, এর কাজা হবেনা যদিও সে যুগ যুগ ধরে রোযা রাখে। (মিশকাত)

অন্যত্র মহান আল্লাহ তায়ালা হাদিসে কুদসীতে এরশাদ করেন, রোযা আমার জন্য, আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (বুখারী ও মুসলিম)

রমযানে করণীয়

* নুযূলুল কুরআন তথা কুরআন মজীদ অবতীর্ণের মাস হিসেবে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। কারণ হাদীসে আছে, 'কুরআন ও রোযা' কিয়ামত দিবসে রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে (আল কুরআন ও বায়হাকী)।

* একটি কাজ ফরজ আদায়ে যেহেতু ৭০টি ফরজের সমান সওয়াব, তাই যত ফরজ ইবাদত রয়েছে তা সময়মত আদায় করা এবং একটি নফলে ফরজের সমান সাওয়াব, তাই বেশি বেশি নফল ইবাদত করা (বায়হাকী)।

*প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ-খবর নেওয়া, যেহেতু হাদীসে আছে এটি সহমর্মিতার মাস। (মিশকাত)

*রোযা অবস্থায় অশ্লীল কাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা, বেহায়াপনা, মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, গীবত, হাসদ, হিংসা-বিদ্বেষ, চুগলী, গালি-গালাজ, বেহুদা কথা-বার্তা কারো অন্তরে কষ্ট দেওয়া, জুলুম করা, নাচ-গান দেখা ও শোনা, টেলিভিশনে অশ্লীল অনুষ্ঠান দেখা, ঝগড়া-বিবাদ করা, পরের হক ধ্বংস করা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ

www.sunnibarta.com

তথা রিপুসমূহ ইত্যাদি কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কাজ থেকে নিজেকে পরহেজ বা বাচিয়ে রাখা। যেহেতু সমস্ত গর্হিত কাজ দ্বারা রোযার সওয়াব অনেক কমে যায়। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ও বাহারে শরীয়ত)

*ভোর রাতে সাহরী খাওয়া। হাদীসে আছে, তোমরা সাহরী খাও এতে বরকত রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

* ইফতারের সময় ইফতার সামনে নিয়ে দোয়া করা। হাদীসে আছে, ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়। (আবু দাউদ)

*খেজুর দ্বারা ইফতার করা। সম্ভব না হলে পানি দ্বারা ইফতার করা। ইফতারে দেরী না করা। কেননা এটি ইহুদি-নাসারাদের অভ্যাস এবং কোন রোযাদারকে ইফতার করানো। যে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমান সওয়াব পাবে। (তিরমিযী)

*শবে ক্বদরের রাত্রিতে জেগে থেকে ইবাদত করা। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় শবে ক্বদরে ইবাদত বন্দেগী করে, তার অতীত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

*যাকাত প্রদান ও বেশি বেশি দান সদকাহ্ করা। যাতে গরীব-অসহায়গণ স্বাচ্ছন্দে রোযা রাখতে পারে। (দূররে মুখতার)

*রমজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করবে সে যেন দুটি হজ্জ্ব ও দু'টি ওমরার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কখনো ই'তিকাফ ত্যাগ করেননি। (বুখারী ও মুসলিম)

*ঈদগাহে যাওয়ার আগে সদকায়ে ফিতর তথা ফিতরা আদায় করা। (আল মুখতাসারুল কুদরী)

উপরোক্ত কুরআন-হাদীসের আলোকে বলা যায়, পবিত্র রমজান মাসের রোযার ফজিলত অত্যধিক, যা ধারণা বা অনুমানযোগ্যও নয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ মহান ফজিলত ওয়ালা মাসের বারাকাত ও ফয়ুজাত দানে ধন্য করুণ। আমিন,চুম্মা আমিন!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর — আল্লাহু আকবার
নারায়ে রিসালাত — ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

রোযা স্বাস্থ্য রক্ষার একটি অতুলনীয় পদ্ধতি

এম.এ. রহীম চৌধুরী

ইসলাম হচ্ছে নীতি-নৈতিকতা, শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্যে যে সব হুকুম-আহকাম দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। যেমন- ইসলাম নামাযের আদেশ দিয়েছে নামায আদায়ের ফলে আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যবস্থা হয় এবং এতে সুস্থতাও সজীবতা পাওয়া যায়। রোযা পালনও আল্লাহর আদেশ, যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে মানুষ! তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমনি করে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববতী লোকদের ওপর, যেন তোমরা (এর মাধ্যমে আল্লাহ্কে) ভয় করতে পারো; (রোযা ফরয করা হয়েছে) কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের জন্যে; (তারপর ও) কেউ যদি (সে দিনগুলোতে) অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা কেউ যদি (তখন) সফরে থাকে, সে ব্যক্তি সমপরিমাণ দিনের রোযা (সুস্থ হয়ে অথবা সফর থেকে ফিরে এসে) আদায় করে নেবে। (এরপরও) যাদের ওপর (রোযা- একান্ত কষ্টকর হবে। তাদের জন্যে এর বিনিময়ে ফিদিয়া থাকবে এবং তা হচ্ছে একজন গরীবকে (তৃপ্তিভাবে) খাওয়াবে। আর (এ সময়) তোমরা যদি রোযা রাখতে পারো তাই তোমাদের জন্যে ভালো; তোমরা যদি রোযার উপকারিতা সম্পর্কে জানতে যে, এতেই কল্যাণ রয়েছে। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৩-১৮৪)

আমরা সবাই জানি সূরা বাকারার ১৮৩ থেকে ১৮৭ নং আয়াত পর্যন্ত ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ বিধান রোযার আলোচনা রয়েছে। এ কয়েকটি আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে, ১৮৪ নং আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত বক্তব্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করলে দেখতে পাই। এখানে বলা হয়েছে, রোযা পালন করা তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। এতে অনেক রকমের উপকার রয়েছে, এখানে বুঝানো হয়েছে কেউ যদি স্বতস্ফুর্তভাবে সৎকাজ করে তবে সে কাজ তার জন্যে অধিক কল্যাণকর।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এক সময় মনে করত, রোযার একমাত্র উপকারিতা হচ্ছে হজম শক্তিতে আরাম পাওয়া। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, রোযা আসলে একটি তিব্বি মোযেজা, অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিস্ময়! এ কারণেই আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা বুঝতে পারো'।

আল্লাহ্ তায়ালা সকল প্রাণীর দেহ কাঠামো এমনভাবে গঠন করেছেন যে, যতোক্ষণ তারা খাদ্যপাণীয় নিয়মিত এবং সময়মতো না পায়, ততোক্ষণ তাদের পক্ষে জীবন ধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। খাদ্যপাণীয় কমবেশী হবার সাথে সাথে তাদের স্বাস্থ্য প্রভাবিত হবে। পশুকুল তাদের বিবেচনা অনুযায়ী খাদ্য পাণীয় গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও সীমালঙ্গন করে, এর ফলে তাদের দেহকাঠামো বিগড়ে যায়, এবং নানা রকম ক্ষতিকর রোগের সম্মুখীন হতে হয়। এ কারণেই অন্যান্য পশু এবং মানুষের রোগের ধরনের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হচ্ছে কিছুদিনের জন্য পানাহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাকস্থলি খালি রাখা, এর ফলে সারাদেহ সুস্থ থাকে, ক্ষুধার কারণে পাকস্থলীর অপ্রোয়জনীয় উপাদন জ্বলে পুড়ে পরিস্কার হয়ে যায়। তার পর পাকস্থলি স্বাভাবিকভাবে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। আর সুস্থ থাকার এ কার্যকর ব্যবস্থার অপর নাম রোযা।

বিশ্বের প্রায় সকল ধর্ম এবং শরীয়তই তাদের অনুসারীদের জন্যে উপবাস থাকার ব্যবস্থা করেছে। ইসলামী পরিভাষায় 'এ উপবাস থাকাকে সিয়াম বলা হয়ে থাকে। হিন্দুরা ২৪ ঘন্টা ব্রত বা উপবাস পালন করে। এ ব্রত পালনকালীন সময়ে তারা আগুনে রান্না করা কোন খাবার খায় না। কিন্তু কাচা দুধ, পানি ইত্যাদি

www.sunnibarta.com

পান করা দোষনীয় মনে করে না। আধুনিক কালের ইহুদিরা মাছ, গোশত ইত্যাদি ত্যাগ করে অন্যান্য জিনিস খেয়ে সেটাকেই রোযা নামে অভিহিত করে। শরীর সুস্থ থাকার উপাদান হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর উপোস থাকার ঘটনা সর্বজন বিদিত। ফিরোজ রাজা লিখিত গান্ধী জীবনে এ কথা লেখা রয়েছে যে, তিনি রোযা রাখা পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন মানুষ খাবার খেয়ে নিজের দেহ ভারি করে ফেলে। এ রকম ভারি অলস দেহ দুনিয়ার কোন কাজে লাগে না। যদি তোমরা তোমাদের দেহ সচল এবং কর্মক্ষম রাখতে চাও দেহকে কম খাবার দাও। তোমরা উপোস থাকো, সারাদিন উপোস করো, আর সন্ধ্যায় বকরির দুধ দিয়ে উপবাস ভঙ্গ কর। (দান্তানে গান্দি)

আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট এবং এরিস্টটল ও মাঝে মধ্যে ক্ষুধার্ত বা উপবাস থাকাকে দেহের সুস্থতা-সবলতার জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন।

আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট বলেন- আমার জীবনে অনেক ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা এবং ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় দু'বেলা আহার করে সে রোগমুক্ত স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারে। আমি ভারতে এরকম প্রচন্ড গরম এলাকা দেখেছি, যেখানে সবুজ গাছপালা খরতাপে পুড়ে গেছে। কিন্তু সেই তীব্র গরমের মধ্যেও আমি সকাল এবং সন্ধ্যায় দুবেলা খেয়েছি। সারাদিন কোন প্রকার পানাহার করিনি। এর ফলে আমি নিজের ভেতর অনুভব করেছি এক ধরনের নতুন সজীবতা এবং অফুরন্ত প্রাণশক্তি। (আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট- মহাফুজুর রহমান আখতারী, দিল্লী)

চিকিৎসকরা স্বীকার করেছেন,রোযা পালন করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী, রোযা হজম শক্তির সঞ্চয়, রক্তের স্বাভাবিক সঞ্চালন, প্রেসার নিয়ন্ত্রণ, কিডনির বিশ্রাম সেল বা কোষের ভারসাম্য, মানসিক ভারসাম্য রক্ষা, রুক্ষতা ও উষ্ণতা রোধ এবং যৌন আকাঙ্খা রোধসহ সকলপ্রকার উদ্বেগ থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখে। তাই চিকিৎসাক্ষেত্রে ডাক্তাররা রোযা পালনের পরামর্শ দেন।

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইসলাম কোন মানুষের ওপর তার শক্তির অতিরিক্ত বোঝা চাপায় না, সুস্থ অবস্থায় রোযা পালন করা প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির ওপর ফরয, কিন্তু অসুস্থতার সময়ে, সফরের সময়ে, বার্ধক্যের সময়ে রোযা রাখা বাধ্যতামূলক নয়, তবে যে সব রোগের প্রতিকারের জন্যে ডাক্তার রোযা রাখার যে বিধান দেন তাদের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা।

অধিকাংশ শিক্ষিত লোক একটি প্রশ্ন করেন, উত্তর মেরুতে এবং দক্ষিন মেরুতে বছরে ছয় মাস দিন ছয় মাস রাত থাকে। সেখানে একদিন আমাদের এক বছরের সমান, সুতরাং তারা কিভাবে রোযা রাখবে? সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলাম কারো ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপায় না। তাই উত্তর মেরুতে ও দক্ষিণ মরুতে অধিবাসীরা যেভাবে নিজেদের কাজকর্ম, পানাহার এবং নামায আদায় করে থাকেন সেভাবেই রোযা পালন করবেন। তাই হবে তাদের স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর ও পালনীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেছিলেন, ইয়াযুয-মাজুজের সময়ে একদিন হবে এক বছরের সমান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের রোযা ছাড়া ও কমপক্ষে প্রতি মাসে তিন দিন রোযা পালন করতেন। তিনি বলতেন তোমরা রোযা রাখো, তাহলে সুস্থ থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) কে তিনটি অসিয়ত করেছিলেন। সে তিনটির মধ্যে একটি ছিলো, প্রতি মাসে তিনটি রোযা পালন করবে।

পরিশেষে ফরিয়াদ করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখেন এবং আমাদেরকে মাহে রমযানের রোযা পালনের তৌফিক দান করেন। আমিন! বেহুরমাতে সায়্যেদিল মুরসালিন সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন

রোযা আমার জন্য, আমি নিজে এর প্রতিদান দেব।

(হাদীসে কুদ্‌ছী-বুখারী শরীফ, ই,ফা-১৭৮৩)

রোযার নিয়্যত

নাওয়াইতু আন্ আসূ-মা গাদাম্ মিন শাহরি রামাদ্বানূল মুবারাকা; ফারদ্বাল্ লাকা ইয়া-আল্লাহু, ফাতাক্বাব্বাল্ মিন্নী-ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামী'উল্ 'আলী-ম।

ইফ্‌তারের নিয়্যত

আল্লা-হুম্মা লাকা সুমতু ওয়া 'আলায়কা তাওয়াক্কালতু ওয়া 'আলা-রিয্‌ক্বিকা আফ্‌ত্বারতু বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া-আর্ হামার্ রা-হিমী-ন।

প্রতি চার রাক্'আত তারাবীহ্ নামাযের পর দোয়া

সুব্‌হা-না যিল্ মুল্‌কি ওয়াল মালাকূতি, সুবহা-না যিল্ 'ইয্‌যাতি ওয়াল 'আয্‌মা তি ওয়াল্ হায়বাতি ওয়াল্ কুদ্‌রাতি ওয়াল্ কিবরিয়া-ই ওয়াল্ জাবারূ-তি, সুবহা-নাল মালিকিল হাইয়্যিল লাযী-লা-ইয়ানা-মু ওয়ালা- ইয়ামূতু আবাদান্ আবাদা-। সুব্বূ-হুন কুদ্দূ-সুন রাব্বুনা-ওয়া রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার্ রূ-হ।

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল (রাঃ) এর লিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং আক্বিদা শুদ্ধ করুন

- নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
- হায়াত মউত কবর হাশর
- আ'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'
- বাংলায় বোখারী শরিফ সংকলন
- প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল
- আহকামুল মাযার
- ফতোয়ায়ে ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া
- ইসলাহে বেহেস্তী জেওর
- শিয়া পরিচিতি
- মিলাদ ও কিয়ামের বিধান
- ফতোয়া ছালাছা
- কালেমার হাকীকত
- কারামাতে গাউসুল আযম
- বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত
- গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস
- ফতোয়াউল হারামাঈন
- ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও না'ত লহরী

হুজুরের কিতাবগুলো এখন অনলাইনে www.sunnibarta.com পাওয়া যায়

দৃষ্টি আকর্ষণ

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, ওস্তাজুল ওলামা, শামছুল মাশায়েখ, শায়খুল ইসলাম

অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রাঃ)

এর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) হাফেজীয়া মাদ্রাসায়

আপনাদের সদকা, যাকাত, ফিতরা, ইত্যাদি প্রদান করে সদকায়ে জারিয়ার কাজে শরীক হয়ে আল্লাহ্ ও তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেজামন্দি হাছিল করুন।

গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদের অফিসরুমে অনুদান গ্রহন করা হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

রমজানুল মোবারক

১৪৩৮ হিজরি (২০১৭ ইং)

রহমতের ১০ দিন

রমযান	তারিখ	বার	সাহরী শেষ	ফজর শুরু	ইফতার
০১	২৮ মে	রবি	৩:৪০	৩:৪৬	৬:৪৪
০২	২৯ মে	সোম	৩:৪০	৩:৪৬	৬:৪৪
০৩	৩০ মে	মঙ্গল	৩:৪০	৩:৪৬	৬:৪৫
০৪	৩১ মে	বুধ	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৪৫
০৫	১ জুন	বৃহ.	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৪৬
০৬	২ জুন	শুক্র	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৪৬
০৭	৩ জুন	শনি	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৪৬
০৮	৪ জুন	রবি	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৪৭
০৯	৫ জুন	সোম	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৪৭
১০	৬ জুন	মঙ্গল	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৪৭

মাগফিরাতের ১০ দিন

রমযান	তারিখ	বার	সাহরী শেষ	ফজর শুরু	ইফতার
১১	০৭ জুন	বুধ	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৪৮
১২	০৮ জুন	বৃহ.	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৪৮
১৩	০৯ জুন	শুক্র	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৪৯
১৪	১০ জুন	শনি	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৪৯
১৫	১১ জুন	রবি	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫০
১৬	১২ জুন	সোম	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫০
১৭	১৩ জুন	মঙ্গল	৩:৩৭	৩:৪৩	৬:৫০
১৮	১৪ জুন	বুধ	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫০
১৯	১৫ জুন	বৃহ	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫১
২০	১৬ জুন	শুক্র	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫১

নাজাতের ১০ দিন

রমযান	তারিখ	বার	সাহরী শেষ	ফজর শুরু	ইফতার
২১	১৭ জুন	শনি	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫১
২২	১৮ জুন	রবি	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫১
২৩	১৯ জুন	সোম	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫২
২৪	২০ জুন	মঙ্গল	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫২
২৫	২১ জুন	বুধ	৩:৩৮	৩:৪৪	৬:৫২
২৬	২২ জুন	বৃহ	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৫২
২৭	২৩ জুন	শুক্র	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৫৩
২৮	২৪ জুন	শনি	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৫৩
২৯	২৫ জুন	রবি	৩:৩৯	৩:৪৫	৬:৫৩
৩০	২৬ জুন	সোম	৩:৪০	৩:৪৬	৬:৫৩

তথ্য সূত্রে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ যুবসেনা

www.sunnibarta.com

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রাঃ)

বিঃ দ্রঃ ইহা ঢাকার সময়।

- রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও যশোরের জন্য ইহার সাথে ৫ মিনিট বাড়াতে হবে।
- নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ৩ মিনিট, চাঁদপুর ৩ মিনিট, কুমিলা ও ফেনীর জন্য ৪ মিনিট এবং চট্টগ্রামের জন্য ৫ মিনিট কমাতে হবে।

তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পূর্ণ (সাওয়াব) লাভ করতে পারবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে জ্ঞাত।
(তরজমা-ই কোরআন কানযুল ঈমান সূরা আল-ইমরান, ৯২)

ধোঁকা দিচ্ছে যেভাবে

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী*

আজকাল গ্রাম-গঞ্জের প্রায়সব মাহফিলে বক্তারা ওয়াজ করেন, কয়েকটি কমন বিষয়ে। যেমন- ওলির কাছে চাইবেন না, শিরক হবে। মাযার পূজা করবেন না, শিরক হবে। মাযারে যাবেন না, শিরক হবে। মাযারে টাকা দিবেন না, শিরক হবে।

ব্যস! গর্জিয়াস কণ্ঠে এ জাতীয় দুয়েকটা কথা বলতে বলতে, শিরকের ভয়াবহতার উপর নাযিলকৃত কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে। যেমন- لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا 'অবশ্যই আল্লাহই আমার মালিক, কাউকে কোনোভাবে আমার মালিকের অংশীদার করিও না'।[১] আরেক আয়াত, لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 'আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না; নিশ্চয় শিরক হচ্ছে, জঘণ্যতম অপরাধ'।[২] এরকম বেশ কিছু আয়াত তারা তিলাওয়াত করে; অসম্ভব বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করে। অত:পর ওয়াজ জমে। তাদের কুর'আন শরিফ তিলাওয়াতের বিশুদ্ধতার ব্যপারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বরকতময় বাণী শুনুন- فَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ. لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ 'তারা কুর'আন মাজিদ তিলাওয়াত করবে, কিন্তু এটা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। অথবা তিনি বলছেন- তাদের শ্বাসনালীর নিচে পৌঁছাবে না, এবং তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়'।[৩]

বলতে পারেন, খুব অল্প সময়ে সে সব বক্তারা সফল। যথেষ্ট সফল। তাদের বক্তব্যে সহজ-সরল মানুষগুলো খাঁটি আল্লাহ ওয়ালা (?) হয়ে গেছে। পীর-ফকির ও মাযার-দরগাহের কথা শুনলে নিরহ সেই লোকগুলোও ফতোয়াবাজি করে! কারো সাথে কথায় হেরে গেলে, অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজও করে। এগুলো ওয়াজের ফসল। এ ব্যপারে হাদিস শরিফে রয়েছে- سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি এবং হত্যা করা কুফুরি'।[৪]

আচ্ছা! ওসব লোকগুলো শিরকের ওয়াজ করছেন ভালো কথা, কখনো কী তাদেরকে শিরক শব্দের অর্থ শেখানো হয়েছিলো? নিশ্চয় তা কখনো হয়নি। লোকগুলো নিরিহ; খুবই নিরিহ। এরকম নিরহ মানুষগুলোর প্রতি আমার অসম্ভব মায়া হয়। কেনো জানেন? কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ যখন সবাইকে ইমাম সহকারে ডাকবেন। ইরশাদ হচ্ছে-يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ 'সেদিন তোমাদের প্রত্যেককে ইমাম সহকারে আহবান করা হবে'।[৫]

সেদিন নিরিহ এই লোকগুলোর কোনো ইমাম থাকবে না; মুরশিদ থাকবে না। তারা থাকবে ওইসব মিথ্যাবাদী ওয়ায়েজ নামক কাজ্জাব ধোঁকাবাজদের কাতারে। আর সে সব আলেম নামক জালেমগুলো থাকবে, শয়তানের কুফুরি দুর্গন্ধময় তাঁবুতে। শয়তান যখন দোযখে চলে যাবে, তখন ওইসব জালেমরাও তাদের সৈন্য-সেনাদের নিয়ে জাহান্নামে চলে যাবে।

আপনারা অনেকে ভাববেন, কেনো আমি এভাবে বললাম। এবার শুনুন! তারা কতোবড়ো মিথ্যুক!

---

১. সুরা কাহাফ-আয়াত:৩৮

২. সুরা লোকমান-আয়াত:১৩

৩. বুখারি: সহিহ বুখারি-৬/২৫৪০ হাদিস নং- ৬৫৩২। মুসলিম: সহিহ মুসলিম-২/৭৭৩ হাদিস নং-১০৬৪। ইমাম মালিক: মুয়াত্তা-১/২০৪ হাদিস নং-৪৭৮। নাসাই: সুনানি কুবরা-৩/৩১ হাদিস নং-৮০৮৯। ইমাম আহমদ: মুসনাদ-৩/৬০ হাদিস নং-১১৫৬৯। ইবনু হিব্বান: সহিহ-১৫/১৩২ হাদিস নং-৬৭৩৭। ইবনে আবি শায়বাহ: মুসান্নাফ-৭/৫৬০ হাদিস নং-৩৭৯২০। বায়হাকি: শু'আবুল ইমান-২/৫৩৭ হাদিস নং-২৬৪০। আবু ইয়ালা: মুসনাদ-২/৪৩০ হাদিস নং-১২৩৩।

৪. ইমাম বুখারি: বুখারি-১/১৯। ইমাম মুসলিম: মুসলিম-১/৫৮। ইমাম আহমদ: মুসনাদ-৬/১৫৭। ইমাম বুখারি: মুফরাদাত-১/১৫৪। ইমাম তিরমিযি: সুনানি তিরমিযি-৪/১৮৮। ইমাম সুয়ুতি: জামেউস সাগির-৩/৩৯। ইমাম নাসাঈ: সুনানি কুবরা-৪/২৪৬। বায়হাকি: সুনানি কুবরা-৮/২০। তিবরানি: মুজামুল কবির-১/৩৭৫। ইবনে মাযাহ: সুনানি-১/২৬। ইবনে হিব্বান: সহিহ হিব্বান-১৮/২৪৩।

৫. সুরা ইসরা-আয়াত: ৭১

কতোবড়ো দাজ্জাল! বলুন তো, শিরকের মানে কী? শিরক মানে শরিক করা বা অংশীদার করা। পরিভাষায় শিরক বলা হয়, আল্লাহর মহান সত্বা ও নিজস্ব গুণাবলির সাথে কাউকে শরিক করা। যেমন- মূর্তিগুলোকে প্রভু সাদৃশ্য মনে করা। দেব-দেবতাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা।

আচ্ছা! মাযারে যাবেন না, মাযারে গেলে শিরক হবে এর মানেটা কী? আমরা কী কখনো বলেছি- (নাউযবিল্লাহ) মাযারে যিনি শায়িত তিনি আল্লাহর পুত্র! আল্লাহর মতো অবিকল! তিনি অন্য এক প্রভু? আমরাতো বলি-তিনি একজন আল্লাহর পূণ্যবান বান্দা; বান্দা মাত্র। যদি বলেন, এসবতো বলেন না। তাহলে শিরক হবে কেনো? বলতে পারেন, আমরা ওলির কাছে সাহায্য চাই ওটা শিরক। ভালো কথা। আমরাও বলি, সাহায্যের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ, আল্লাহ ব্যতিত কারো নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক।আগে একটু লক্ষ্য করুন।

আল্লাহর বান্দাগণ সাহায্য করেনঃ

আচ্ছা! যে মৌলভীকে শিরকের চিৎকারে মানুষের ঘুম ভাঙানোর জন্য মাইক লাগিয়ে দিয়েছেন, এই মৌলভীকে টাকা দিবেন না? হুযুরের জন্য যে, পোলাও বিরানির আয়োজন করছেন, টাকা লাগেনি? এতোগুলো মাইক লাগাইছেন, ভাড়া দিবেন না? পেন্ডেল সাজালেন, খরচ লাগবে না? নিশ্চয় সব লাগবে। তাহলে এতো টাকা পেলেন কই? মাহফিলের আগের রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে পড়ে কমিটির সব লোকেরা কী আল্লাহর সমীপে এই টাকা চেয়ে নিয়েছিলেন?

উত্তরে যদি না বলেন, তাহলে কোথায় পেলেন এতো টাকা? চুরি-ডাকাতি করছেন? নিশ্চয় না। কারো না কারো থেকে চেয়েই নিয়েছেন। এলাকার কুলি-মুজুর থেকে শুরু করে বিত্তশালী পর্যন্ত কাউকে বাদ দেননি। সবার কাছে মাহফিল মাদরাসার নাম দিয়ে সাহায্য নিয়েছেন।

অথচ আপনারাইতো বলেন, আল্লাহ ব্যতিত কারো নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক। তাহলে আপনারা কী মুশরিক? খামাকা তা যদি জায়েয হয়, আল্লাহর ওলিদের নিকট চাওয়া শিরক হবে কেনো? সম্পদশালীগণ যেভাবে খোদাপ্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করছেন, পূণ্যবান ওলিরাও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামাত থেকেই সাহায্য করেন। বলতে পারেন, সম্পদশালীদের সম্পদ পবিত্র নাকি অপবিত্র তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, যদিও তা গ্রহণ করা বৈধ। কিন্তু ওলিদের সম্পদতো ঐ সম্পদ যা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ। ইরশাদ করছেন- فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا 'যাদের উপর আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন তারা হলো- নবী, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ, এরা কতোই উত্তম সঙ্গি'।[৬]

আয়াতে কারিমা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, আল্লাহর নেক বান্দাগণ স্বয়ং রব থেকেই নিয়ামত প্রাপ্ত। আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিয়েছেন, আমাদের প্রার্থনা এমনই হওয়া উচিত- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 'আমাদেরকে সেই পথে পরিচালিত করুন, যে পথে তোমার নিয়ামত প্রাপ্তবান্দাগণ রয়েছে।

খোদা প্রদত্ত নিয়ামতের সেই ভান্ডার থেকেই ওলিগণ আল্লাহর বান্দাগণকে দান করেন। ব্যবধান কেবল এইটুকু দুনিয়াবাজ বান্দাগণের নিয়ামাত দুনিয়াতেই নিঃশেষ হয়ে যায়; কিন্তুপূণ্যবান বান্দাগণের খোদাপ্রদত্ত নিয়ামত ভান্ডার কখনো শেষ হয় না। ফলে তারা ইন্তিকালের পরেও বান্দাগণের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে পারেন।

যেমন- নবী কারিম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ব্যপারে সমস্ত আম্বিয়া কিরামদের নিকট আল্লাহপাক সার্বিক বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছিলেন। মহান আল্লাহ একথাও বলেছিলেন- ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ 'অত:পর ওই রাসুল যখন তোমাদের মধ্যে তাশরিফ আনবেন, তোমাদের কিতাবগুলো সত্যায়ণ করবেন, তখন নিশ্চয় তোমরা তার

www.sunnibarta.com

৬. সুরা নিসা- আয়াত নং-৬৯।

উপর ইমান আনবে, এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে' ।[৭]

এখানে সাহায্য করতে বলা হয়েছে, অথচ মহান আল্লাহ একথাও ভালো জানেন যে, তখন সমস্ত নবীগণ ইন্তিকাল হয়ে যাবেন। বুঝা গেলো আল্লাহর পূণ্যবানরা ইন্তিকালের পরও সাহায্য করতে পারেন। এ জন্যে মুসা কালিমুল্লাহ (Θ) মিরাজের রাতে রাসুলে কারিম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে সাক্ষাত করে, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায থেকে পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান করতে সাহায্য করেছিলেন ।[৮] যা উনার ইন্তেকালের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরের ঘটনা। এরকম অসংখ্য বর্ণনা আছে, প্রবন্ধ বড়ো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উল্লেখ করা হলো না।

শিরিকের অপবাদ কাদের প্রতি!

এবার দেখুন! শিরিকের অপবাদ কারা দেয়; কাদের প্রতি দেয়। ওসব গুন্ডা শয়তানরা সত্যিকার ইমানদার মুসলমানগণকে শিরকের অপবাদ দিবে এ ব্যাপারে সরাসরি হাদিসেপাকের বর্ণনা পড়ুন। 'হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন- নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে আমার যে বিষয়টি অধিক ভয় হয় তা হলো ওই ব্যক্তি, যে কুর'আন পড়বে এমনকি কুর'আনের উজ্জ্বলতা তার উপর দেখা যাবে। আর তা ঐসময় পর্যন্ত যে পর্যন্ত আল্লাহ চাহে। অত:পর তার থেকে ইসলাম খসে পড়বে, সে তা পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করবে এবং তার প্রতিবেশিদেরকে তরবারি নিয়ে অবিরাম দৌড়াবে, তাদেরকে শিরকের অপবাদ দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম-

يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الرَّامِي ، أَوِ الْمَرْمِيِّ ؟
قَالَ صلى الله عليه وسلم : بَلِ الرَّامِي

হে আল্লাহর নবী! উভয়ের মধ্যে শিরকের অধিক নিকটবর্তী কে? শিরকের অপবাদ দানকারী, নাকি যাকে শিরকের অপবাদ দেয়া হচ্ছে সে? তিনি ইরশাদ করছেন- শিরকের অপবাদ দানকারী' ।[৯] বুঝাগেলো, শিরকের নিকটবর্তী আমরা নই; যারা অপবাদ দেয়- তারা। শিরক করলে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়, তাই তাদেরকে খারেজি বলা হয়। খারেজিদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামদের মনোভাব দেখুন! বুখারি শরীফে রয়েছে-

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব দুরাচার খারেজিদেরকে আল্লাহর সৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করতেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন- নিশ্চয় তারা ওইসব আয়াতের দিকে মনোনিবেশ করছে, যে সব আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। অত:পর সে সব আয়াতকে ঈমানদারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে' ।[১০]

যিয়ারত ও পূজা:

যারা মাযার মান্য করে, মাযারের যিয়ারত করে, তাদেরকে মাযার পূজারি বলে অপবাদ দেয়া হয়। মাযার পূজা শব্দটি শুনলেই সহজ-সরল ও নিরীহ মানুষগুলো খোদার ভয়ের আঁতকে উঠে। এসব ওয়াজ কোথায় করা হয় জানেন? যেসব এলাকায় কোনো মাযার নাই, যেমন- কক্সবাজারের আশ-পাশের অঞ্চলসমূহ। কাদের সামনে করা হয় জানেন? যারা জীবনে কখনো মাযার দেখেনি। কাদেরকে বুঝানো হয় জানেন? যারা নিরেট লিখতে-পড়তে পারে না।

এসব কথায় আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। এটা একটা ধোঁকা বা প্রতারণামূলক শব্দ। মাযার মানে যিয়ারতের স্থান। আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন ওলিদের

[৭]. সুরা আলে ইমরান: আয়াত-৮১

[৮]. আহমদ ইয়ারখাঁন নাঈমি: নুরুল ইরফান-১/১৫৫ (বাংলা)

[৯].বুখারি: তারিখুল কাবির-১/২৮২ হাদিস নং-৮১। ইমাম সুয়ুতি: জামেউল আহাদিস-৩৪/২৭৪ হাদিস নং-৩৭৩০৮। ইবনে হিব্বান: সহিহ ইবনে হিব্বান-১/৮৪ হাদিস নং-৮১। হিন্দি: কানযুল উম্মাল-২৭/৪০৭ হাদিস নং-৮৯৮৬। ইমাম তাহাভী: মুশকিলুল আসার-২/৩৫২। হায়সুমি: জাওয়ায়েদ-১/১৮৮ । ইবনে কাসির: তাফসিরে ইবনে কাসির-২/২৬৬।

[১০]. ইমাম বুখারি: বুখারি শরিফ-৬/২৫৩৯ পৃ.

বরকতময় আরামগাহকে মাযার বা দরগাহ বলা হয়। যিয়ারত একটি পূণ্যময় ইবাদাত। সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাতে মুবারাকা। হাদিস শরিফে রয়েছে- كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُور فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করতাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা যিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনিহা সৃষ্টি করে এবং পরকালের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়'।[১১]

শয়তান কখনো চায় না, আমরা প্রতিনিয়ত ইবাদাত করি। তাই আরাধনার পূণ্যতা থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে অভিশপ্ত শয়তানের অনুচররা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অনেকে ভাববেন, মানুষ কেমনে শয়তান হয়? হ্যাঁ অবশ্যই মানব শয়তানও আছে। যেমন-

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

'মানুষের অন্তরসমূহে প্ররোচনা দেয়, জ্বিন ও মানুষ'।[১২] ধরে নিলাম, মাযারে পূজা হয়! বলেনতো পূজায় কী কখনো কুর'আন শরিফের তিলাওয়াত হয়? পূজায় কী কখনো লা'শরিক আল্লাহর যিকির করা হয়? পূজায় কী কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বরকতমন্ডিত দরুদ পাঠ করা হয়? পূজায় কী কখনো আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে মুনাযাত করা হয়? অথচ যিয়ারতে কুর'আনুল কারিমের তিলাওয়াত করা হয়। মহান রাব্বুল আলামিনের যিকির করা হয়। নবীজি সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর দরুদ শরিফ পাঠ করা হয়। যিয়ারতের শেষে রব সমীপে মুনাযাত করা হয়। তবে এতোপূণ্যময় ইবাদাতকে বিধর্মীদের পূজা-অর্চনার সাথে তুলনা করছেন কেনো? কুর'আন মাজিদের তিলাওয়াত কী কখনো পূজা হতে পারে? আল্লাহর যিকির কী কখনো পূজা-অর্চনার সাথে মিলানো যায়? হুযুর নবী কারিম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর প্রেরিত দরুদ শরিফ কী কখনো পূজা হতে পারে? খোদার দিকে মনোনিবেশ করে দোয়া কী পূজায় করা হয়?

উত্তরে যদি না বলেন, তাহলে যিয়ারতকে কেনো পূজা অর্চনার সাথে তুলনা করছেন? এটা কী দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার শামিল নই? এমনটি যদি হয়, তবেতো ইসলামি শরিয়তের ফায়সালা অনুযায়ী তা সম্পূর্ণ কুফুরি। যেমন- الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر 'যে কেউ ইসলাম বা সমগ্র ধর্মের কোন অংশ নিয়ে ঠাট্টা করে; সে বড় কুফুরি করলো'[১৩]। যিয়ারত হলো সুস্পষ্ট সুন্নাত।সুন্নাতে মোস্তফা সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে এভাবে সরাসরি অবজ্ঞা করাতো আরো ভয়াবহ কুফুরি। যেমন- الاستهزاءَ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة كفر بلا ريب 'রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র সুন্নাতকে কেউ যদি বিদ্রুপ প্রতিপন্ন করে; সেটা সুস্পষ্ট কুফুরি এতে কোন সন্দেহ নেই'[১৪]।

নবী-ওলিদের মাযার হওয়া শিরিক নয়:

মাযারগুলো তাঁদের স্মৃতির স্মারক। আল্লাহর সাধারণ বান্দাগণ যেনো, সেই স্মারকগুলো দেখে দেখে তাঁদেরকে স্মরণ করতে পারেন। তাঁদের বরকতময় কবরসমূহ যিয়ারত করে পূণ্যতা হাসেল করতে পারে। যারা মাযহাব-মিল্লাতের খিদমত করেন, তাঁদের মর্যাদা খোদার পক্ষ থেকে বন্টিত। মহান আল্লাহও চান, তাঁদের স্মৃতি যেনো রয়ে যায় জনম জনম। তাই কুর'আনের পাতায় এমন ক্ষণজন্মা বহু-মহাত্মাদের কথা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। যেমন- আসহাবে কাহাফের ঘটনা সম্পর্কে মহান পারওয়ার দিগার বলেন-

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا

---

[১১]. ইমাম আহমদ: মুসনাদ-৩৮/১১৩ হাদিস নং-২৩০০৫। তিবরানি: মুজামুল কাবির-২/১ হাদিস নং-১১৫২। আবদুর রাজ্জাক: মুসান্নাফ-৩/৫৬৯ হাদিস নং-৬৭০৮। হায়সুমি: মাজমাউজ যাওয়ায়েদ-৪/২৬ হাদিস নং-৫৯৯৩।

[১২]. সুরা নাস: আয়াত-৫-৬।

[১৩].আবদুল আযিয বিন আবদুল্লাহ বিন বায; মজমুয়ায়ে ফতোয়া, ১০/২৬১ পৃষ্ঠা।

[১৪]. শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন আবদুল লতিফ; ফতোয়া রসায়েলে সমাহাত- ১/১৭৪ পৃষ্ঠা, মাতবাতুল হুকুমত, মক্কা।

'অতঃপর তারা বললো, তাদের গুহার উপর কোনো ইমারাত তৈরি করো! তাদের রব তাদের বিষয়ে ভালো জানেন। যারা এ বিষয়ে প্রবল ছিলো তারা বললো, শপথ রইলো যে, আমরা তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করবো'[১৫]।

আসহাবে কাহাফের সম্মানিত ওলিগণের কবরের কিনারে মসজিদ নির্মান সম্বলিত এই আয়াতে করিমার ব্যাখ্যায় অসংখ্য ওলামায়েদ্বিন আল্লাহ্‌র পূণ্যবান বান্দাগণের মাযারের উপর গম্বুজ নির্মানসহ মসজিদ করাকে বৈধ ও উত্তম বলে অভিমত পোষণ করেছেন। কেননা, চতুর্দিকে সজ্জিত ইমারত ও গম্বুজ থাকলে দেখতে খুব সুন্দর দেখায় এর নিচে বসে মহান রবের বান্দাগণ নিপুন অন্তরে ইবাদত করতে পারেন।

ভালোর সাথে মন্দ থাকে:

ভালোর সাথে মন্দ সবখানে আছে। পাপ কী শুধু মাযার কেন্দ্রীক হয়? কেবল মাযারের বিরুদ্ধে বলেন কেনো? অন্য কোথাও কী পাপ হয় না? নিশ্চয় হয়। যেমন- মসজিদ ইবাদাতের জায়গা। মসজিদ যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিশ্চয় তিনি ইবাদাত করার জন্যই করেছেন। কিন্তু সেখানে যদি প্রতিনিয়ত জুতা চুরি হয়, চুরি যেহেতু গোনাহ! সেই হিসেবে আপনি কী কখনো মসজিদ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বলেছেন? মসজিদে যাওয়ার বিরুদ্ধে ওয়াজ করেছেন? কখনো না।

আপনার চলন-বলন হবে পাপের বিরুদ্ধে। ভন্ডের বিরুদ্ধে। প্রতারকের বিরুদ্ধে। চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে। তখন আপনার সাথে আমরাও আছি। আল্লাহ্‌র পূণ্যবান নবী-ওলিদের মাযার হবে। প্রতিনিয়ত মানুষ যিয়ারত করবে। তাঁদের বরকতময় কবরগুলিতে গেলে পরকালের কথা স্মরণ হবে। মাযারগুলো দেখে দেখে তাঁদের বর্ণাঢ্য জীবনী অনুসন্ধান করে শিক্ষার্জন হবে।

হয়তো অনেকে বলবেন, যিয়ারততো এমনিতে করা যায়। মাযারের কী প্রয়োজন? হ্যাঁ মাযার নির্মান করা ইসলামি শরিয়তের কোথাওতো হারাম ফায়সালা দেয়া হয়নি। তাই মাযার হলে সমস্যা কী?

মাযার বা স্মৃতির স্বারক যদি না থাকে তাহলে কালের আবর্তনে এসব হযরাতে কিরামগণের নাম-নিশানা হারিয়ে যাবে। তাঁদের অবদানের কথা মানুষ ভুলে যাবে। মহান রাব্বুল আলামিন কখনো চান না, এসব পূণ্যাত্মাগণ এভাবে হারিয়ে যাক। দয়াময় প্রভু চান, তাঁদের পবিত্র নাম যেনো ধরার বুকে যুগযুগ রয়ে যায়। যেমন- নবীপত্নী হযরত হাজেরা শিশু নবী ঈসমাইল আলাইহিস সালামের খিদমতে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করেছেন, সেই স্থানের স্মৃতিও আল্লাহ পাক চির সম্মানিত ও বরকতময় স্থান হিসেবে অক্ষত রেখেছেন। কালামে মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভূক্ত, সুতরাং যে কেউ কাবাঘরে হজ্জ্ব বা ওমরা সম্পাদন করে, দু'টি প্রদক্ষিণ করে তার উপর কোনো গুনাহ নেই, এবং কেউ কোনো সৎকর্ম স্বত:স্ফুর্তভাবে করবে, আল্লাহ সৎকর্মের পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ'।[১৬]

সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় নবীমাতা হাজেরার মাযার না; আস্তানা। দেখুন! ওলিদের আস্তানার সম্মান কতো! আস্তানায় কবরের চিহ্ন থাকে না; বরকত হাসিলের নিদর্শন থাকে।

প্রিয়পাঠক! প্রতারিত হবেন না:

ধোঁকাবাজ সেসব ওয়ায়েজগণ যেসব আয়াত দিয়ে বক্তব্যে নিজেকে গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা করে, ওলি মানতে নিষেধ করে, মাযারে যেতে বারণ করে, এমন সব আয়াতে কারিমা মুশরিকদের উপর মূর্তির বিরুদ্ধে নাযিলকৃত আয়াত। সুতরাং এতে প্রতারিত হবেন না। ওসব আয়াতসমূহ কি আমরা পড়ি না? মুমিনদেরকে

১৫. সুরা কাহাফ: আয়াত-২১

১৬. সুরা বাকারা: আয়াত-১৫৮হ্ন

ওলির দরবারে যেতে নিষেধাজ্ঞার উপর একটি আয়াত কিয়ামত পর্যন্তও দেখাতে পারবে না। মাযারে যেতে নিষেধ করেছেন, এমন একটি আয়াত জীবনেও দেখানো সম্ভব না। যিয়ারতকে পূজার সাথে তুলনা করা যায়, এমন একটি আয়াত কখনো দেখাতে পারবে না। সুতরাং প্রতারিত হবার কোনো কারণ নেই।

আমি জানি, অনেকে আরো প্রমাণ চাইবেন। দলিল খুঁজবেন অহরহ। আলহামদু লিল্লাহ! সুন্নি জামাতের সমস্ত আকিদার প্রমাণাদি এই বান্দার নিকট একান্তই মওজুদ আছে। বহু প্রমাণ থাকার পরও আমি সবকটি দলিল দিয়ে প্রবন্ধের কলবর বাড়াচ্ছি না। কারণ, যারা দলিল খুঁজছেন তাদেরকে যদি নিরেট প্রমাণ দিতে দিতে লিখাটিকে বড়ো করি, কিতাবের কয়েকটি স্তুপও দিই, তখনও বিশ্বাস করবেন না; এড়িয়ে চলবেন। তবু জীবনের কোনো মুহূর্তে যদি সত্যি সত্যি দলিলের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে হৃদয়কে পরিষ্কার করে, জান্নাতের রাস্তা পাওয়ার নিয়তে আমার কাছে আসবেন; প্রমাণ দিবো। আমি যদি মরে যাই, তবে সুন্নিদের মুহাক্কিক আলিম ওলামার কাছে স্মরণাপন্ন হবেন। শর্ত একটাই, দলিল দেয়ার পর ইঁদুরের মতো পালাবার গর্ত খুঁজবেন না, প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না; সুন্নি হয়ে যাবেন।

মনে রাখবেন, সুন্নি আলিম-ওলামাদের জ্ঞান কেবল কুরআন বা বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ পড়ে অর্জিত জ্ঞান নয়। সুন্নিদের জ্ঞান আল্লাহ-রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দয়া ও ফযল বদান্যতার ফসল। অনেকে ভাববেন, আমি ভন্ডামির পক্ষ্যে লিখছি। না এরকম কখনো হতে পারে না। আমি সুন্নি; সুন্নিরা কখানো ভন্ড হয় না। কতিপয় ভন্ড কেবল সুন্নি সাজে।

গলাবাজ বক্তাগণের আরেক ধোকা!

সৌদি আরবে নাকি মাযার নাই। দেখুন! কতোবড়ো মিথ্যেবাদী! যেখানে একজন আবেদা মহিলা হযরত হাজেরার সম্মানিত আস্তানা সাফা-মারওয়া এখনো অক্ষত আছে, সেখানে নাকি মাযার নাই! উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (ρ)'র রচিত 'জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' অবশ্যয় কিতাবটি বায়তুশ শরফের মারহুম পীরসাহেব আবদুল জাব্বার'হৃদয়ের টানে মদিনার পানে' নামে অনুবাদ করেছেন। পড়ে দেখুন। সেই কিতাব অধ্যায়ণ করলে বুঝতে পারবেন, তৎকালিন আরবে কোথায় কোথায় মাযার ছিলো। কোথায় কার মাযার ছিলো। কার মাযারের গম্ভুজ কেমন ছিলো। কার মাযারের দরজা কোন দিকে ছিলো।

তখনকার আরবে মাযার ছিলো। মাযারে গম্ভুজ ছিলো। প্রাচীন আরবের ছবি দেখলেও বুঝবেন, উম্মুল মোমেনিন হযরত খাদিজাতুল কোবরা (ϑ)'র মাযার শরিফ কতোটা চমৎকার ছিলো। সেসব মাযার যিয়ারতের রচমও ছিলো।

তাহলে এখন নেই কেনো? ইতিহাস পড়ুন! জানতে পারবেন, এসব বরকতমন্ডিত মাযার কীভাবে ধ্বংস করা হলো। আল্লামা যিয়াউল্লাহ কাদেরি রচিত 'ওহাবি মাযহাবের হাকিকত' বইটি পড়লে স্পষ্ট হয়ে যাবে পুরো ঘটনা। নরপিচাশ, নরকের কীট, শয়তানের শিং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদি (আল্লাহর গযব তার প্রতি অঝরায় বর্ষিত হোক)! এই নরাধম সমস্ত মাযার ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

মাযার পূজা! মাযার যাওয়া শিরিক! এই সমস্ত পঁচাশব্দগুলোর প্রবর্তক এই জালেমই। বর্তমানে যারা মাযার বললে পূজা বলতে বলতে মুখে শিরকের ফেনা তুলে, তারা প্রত্যেকেই সেই নদজীর দালাল।

মিনিট কয়েকের জন্য না হয় ধরেই নিলাম, সৌদি আরবে মাযার নাই। মদিনা শরিফ কী তাহলে আরবের বাহিরে? যদি বলেন ভেতরে, তাহলে রাসুলুল্লাহ (Γ)'র মাযার শরিফ কোথায়? সেখানে ইসলামের দু'মহান খলিফার পবিত্র রওজা শরিফও কী নাই?এবার দেখুন! খোদাদ্রোহীরা আরবে মাযার নাই বলে বলে কতো জঘণ্য মিথ্যাচার করছে! কী ভয়ঙ্করভাবে ধোঁকাবাজি করা হচ্ছে সহজ-সরল মুসলমানদের সাথে।

কতিপয় জাহেল প্রবাসিদের বকধার্মীকতাঃ

www.sunnibarta.com

আমাদের দেশে অনেক সাধারণ প্রবাসিরা সৌদি আরবে বছর কয়েক ঘুরে এসে, গায়ে জুব্বা লাগায়, মাথায় কালো চাকবাঁধে, গায়ে আতর লাগায়, সুফি-সাধক ভাবধরে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ইচ্ছেকৃত দুয়েকটি আরবি বলার চেষ্টা করে। মা'আ (পানি) লাহাম (গোশত) সামাক (মাছ) এই টাইপের আরবি। এরা শরিয়তের যেকোনো জটিল-কঠিন মাস'আলা নিয়ে মাথা ঘামানোর চেষ্টা করে। কথায় কথায় সৌদি আরবের উদাহরণ দিয়ে সাধারণ মানুষকে কাবু করার চেষ্টা করে। হাব-ভাব দেখে মনেহয়, কয়েকদিন বিদেশ অবস্থান করে জ্ঞানের গোটা একটা পাহাড় হয়ে গেছে!

সমাজে একদল নিরহলোক তাদের কথায় যথেষ্ট সাপোর্ট দেয়। এসব বকধার্মীকদের তার কথায় উঠে আর বসে। সর্বদা তার পক্ষে সাপাই গায়। তাদের দেয়া যে কোনো ফায়সালা বিড়ালের মতো মেনে নেয়ার চেষ্টা করে। এটা কিন্তু ওসব লোকের জ্ঞানের কারণে নয়; চাপাবাজির কারণে। মূর্খরা চাপাবাজি যথেষ্ট পছন্দ করে। এইসব লোক থেকে সবসময় দুরে থাকবেন। তারা সরাসরি ইসলামের শত্রু না হলেও তাদের আচণরবিধি চরম ঈমান বিধ্বংসী।

সৌদি আরবে এই নাই, আমাদের দেশে থাকবে কেনো? সৌদি আরবে সেই নাই, আমাদের দেশে করবে কেনো? এইধরনের কথা নিরেট জাহেল ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। জ্ঞানিরা দেশ দেখে না; তারা দেখে শরিয়তের দলিল। অনুসরন করার মতো প্রাচিন সেই জযিরাতুল আরব এখন নেই। এখন বানোয়াটি শাসনরীতি ও অধিকাংশ মনগড়া মতোবাদে বিশ্বাসে গঠিত সৌদি আরব।

নবীজি (Γ)'র মাযার আছে, তার চেয়ে মাযার নির্মানের বড়ো দলিল আর কী হতে পারে? সিদ্দিকে আকবর, ফারুকে আযমের মাযার আছে, পূণ্যবান ব্যক্তিদের মাযার নির্মানের জন্য এর চেয়ে বড়ো দলিল আর কী পারে? হয়তো অনেকে বলবেন- এগুলো সাহাবি-তাবেয়িদের যুগে করা হয়নি। এটা যদি খামাকা পাপ হলে, তবে নবীজি (Γ)'র মাযার নির্মাতার উপর খোদার গযব পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়নি কেনো?

ওরা ভন্ড; ভন্ডরা কেউ সুন্নি নয়ঃ

যারা ওলির নামে বোলি। নামায নাই, রোযা নাই, হজ্ব নাই, যাকাত নাই, দিবা-নিশি মুরিদ বাড়ানোর চিন্তায় পেরেশান থাকে, শরিয়তের ধারধারে না, ওরা সুন্নি না; ভন্ড। মাযারে ওলি নাই, অমুক বাবার আস্তানা, তমুক বাবার পায়খানা, ওসব বলে বলে বড়োসড়ো কবরের মতো করে, রওজা কিংবা আস্তানা শরিফের সাইনবোর্ড টাঙায়, দানবাক্স লাগায় তারা সুন্নি না; এরা প্রতারক। সুন্নি হলে কখনো এসব করতে পারে না। এরা সুন্নিদের দুশমন; ইসলামের চরম শত্রু।

মাযারে অহেতুক দিন-দুপুরে মোমবাতি জ্বালে। দেয়ালে মান্নতের চুনা লেপে। জীবনে মসজিদে গিয়ে রব সমিপে কখনো সিজদা করে না, কবরে এসে ধামকরে সিজদায় অবনত হয়, ওরা সুন্নি না; চরম দূর্ভাগা মুনাফিক। সুন্নিদের সিজদা আল্লাহর জন্য হয়; বান্দার জন্য নই। যারা ওরসের নাম দিয়ে গাঁজা খেয়ে লাফালাফি করে, মদ্যপানে বেহুদা পাগলামি করে, তারা ধর্মের কেউ না; নরকের কীট।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা কোনো ওলির শিক্ষা হতে পারে না। কাউয়ালির নাম দিয়ে কঁচি-কাঁচা যুবতির কণ্ঠে মুর্শেদি গানের যারা আয়োজন করে, তালাশ করে দেখুন! তাদের প্রত্যেকের জন্মগতভাবে সমস্যা আছে; তারা জারজ।

রিকশায় মাইক বেঁধে, অমুকবাবা-তমুকবাবার শানে গান বাজিয়ে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যারা ওরসের নাম দিয়ে চাঁদাবাজী করে, তাদেরকে ধরেন! মারেন! পেটান! দেখবেন, সবাই খুশি হবে। ওসব নরাধমরা কখনো আওলিয়া কিরামের কেহ না; তারা ছদ্মবেশী প্রতারক। দুরাচার।

www.sunnibarta.com

এমনসব যতোভন্ড তাদের কথা বলে বলে সুন্নিদেরকে অকথ্য ভাষায় যারা গালি-গালাজ করে, ওয়াজে গলাবাজী আর গালবাজী করে, তারা চরম মিথ্যেবাদী। ভন্ডরা যেমন ভন্ডামি করে জঘণ্য পাপ কামাই করছে, এসব ওয়ায়েজ নামক কাজ্জাবগুলোও মিথ্যেচার করে করে ভয়াবহ পাপ কামাই করছে।

সে নিজেও জানে, সুন্নিরা কখনো এসব করে না; ভন্ডরা করে। ভন্ড কখনো সুন্নি হতে পারে না। মূলত: ভন্ডদের কথাগুলো সুন্নিদের নাম দিয়ে সরলমনা মুসলিম মিল্লাতের নিকট প্রচার করে রীতিমতো পথভ্রষ্ট করছে। ধিক্কার সেসব মানবরূপী মিথ্যেবাদী শয়তানদের প্রতি।

মিথ্যাবাদীর স্বরূপ দেখুন!

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যেসব হাদিস শরীফ দিয়ে ধোঁকাবাজরা মাযারের বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজি করছে, সেসব কুর'আনের আয়াত ও হাদিসেপাক একটাও মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বিধর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তার একটি প্রমাণ দেখুন! 'হযরত আবুল হায়'আজ আসাদি (I) বলেন, হযরত হযরত আলি (I) আমাকে বলেছেন- আমি কী তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না? যে কাজে নবীজি (Γ) আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? কাজটি হলো, তুমি কোনো মূর্তিকে ধ্বংস করবে। আর কোনো উঁচু কবর দেখলে সমান করে দেবে।'

এটা হচ্ছে মাযারের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড়ো দলিল। হাদিসের অনুবাদটি যদি বুঝে না আসে কয়েকবার পড়ে দেখুন। এবার সুস্থ বিবেকে বলুনতো, এখানে কী কোনো মুসলমানের কথা বলা হয়েছে? নাকি মূর্তির কথা! যেখানে মূর্তি ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে, সেখানে কী কোনো মুসলমানের কবর ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন? নাকি বিধর্মীদের কবরের কথা! বেকুবের বোকামী দেখে, মাঝেমধ্যে আক্কেলগুড়ুম হয়ে যায়। পাগলের দল কোথাকার!

হাদিসের 'হা' বুঝে না। আবার ফতোয়াবাজি! আল্লাহর কুর'আন ও রাসুলুল্লাহ (Γ)'র হাদিস শরীফের উপর এভাবে মনগড়া ব্যাখ্যাদানকারীর স্থান জাহান্নাম ছাড়া আর কী হতে পারে বলুন!

হাদিসটির শরাহ পড়া লাগবে না, অনুবাদটা ভালোমতো পড়লে বুঝা আসবে, ইনশা আল্লাহ! এবার কাহিনি শুনুন- কোনো একযুদ্ধে যাওয়ার সময় ঐযুদ্ধের সেনাপতি হযরত আবুল হায়'আজ আসাদি (I) কে মাওলা আলি শেরেখোদা (I) কথাটি বলেছিলেন। যেনো বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ করার সাথে সাথে তাদের মূর্তিগুলো ভেঙে দেয় এবং তাদের দেব-দেবতার কবরগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, পরে যেনো কবরের কোনো স্মৃতি সেখানে থেকে না যায়।

বিধর্মীদের কবরের কোনো চিহ্ন থাকতে পারে না। তাদের কোনো স্মৃতি থাকুক, তাদের কোনো স্বারক সম্মানিত হয়ে রয়ে যাক, সেটা কখনো আল্লাহ এবং রাসুলেপাক (Γ) চান না। সেজন্যে পৃথিবীর খ্যাতিজুড়া বড়োবড়ো বাদশা, ফির'আউন, নামরূদ, হামান, শাদ্দাদ, আবু জেহেল, আবু লাহাব, উতবাহ, শায়বাহর কোনো মাযার নেই। মাওদুদি, আলবানিসহ কোনো মুনাফিকের মাযার বা রওজা নেই। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বড়োবড়ো হযরাতে কিরামগণ ব্যতিত কারো রওজা নেই।

পক্ষান্তরে নবী-রাসুল, ওলি-আওলিয়াসহ ইসলামি শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারিফাতের ইমামগণের মাযার আছে। সুন্নি জামাতের মুহাক্কিক বুযুর্গানে দ্বীনদের বরকতময় রওজা আছে। সুতরাং প্রতিয়মান হয়, ইসলামি শরিয়তে মাযারের চমৎকার বিধান রয়েছে। খোদাদ্রোহী-রাসুলবিদ্বেষীদের মাযারের কোনো নযির ইসলামের ইতিহাসে নেই। তাই সমস্ত ভন্ডামী ছেড়ে আল্লাহর পূণ্যবান আওলিয়া কিরামগণের মাযার সংরক্ষণ ও যিয়ারতে এগিয়ে আসুন। যারা মাযার নিয়ে ব্যবসা

www.sunnibarta.com

করছে, অবিরাম শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ করছে, সেসব দুরাচারদের প্রতিরোধ করুন।

***লিখক:** পরিচালক, আর-রায়হান ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি, রামু, কক্সবাজার। email:azizrazavi.net@gmail.com

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA
www.sunnibarta.com

ইসলামের বাস্তব কাহিনী

হযরাতুল আল্লামা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর(রহঃ)

ওয়াদা রক্ষা

একদিন ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দরবারে বিচার কার্য চলছিল। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন মামলার মীমাংসা করা হচিছল। সে সময় দু'জন যুবককে ধরে দরবারে নিয়ে আসলো এবং আরজি পেশ করলো, হে আমীরুল মুমেনীন! এ জালিম থেকে আমাদের হক আদায় করে দিন। সে আমাদের বৃদ্ধ পিতাকে মেরে ফেলেছে। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই যুবকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- ওদের আরজির কথাতো তুমি শুনেছ। এখন তোমার কি বক্তব্য আছে? সে খুবই আদবের সাথে অপরাধ স্বীকার করে বললো, সত্যিই আমি এ অপরাধ করেছি। রাগের মাথায় আমি এক পাথর নিক্ষেপ করে ছিলাম, যার আঘাতে সেই বৃদ্ধ লোকটি মারা গেছে। আমার রাগের কারণ হলো, লোকটি আমার প্রান প্রিয় উটটিকে ওনার বাগানে ঢুকার কারণে মেরে চোখ ফুটা করে দিয়েছে।

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) সব কথা শুনার পর তাঁর রায়ে বললেন তোমার পক্ষ থেকে যেহেতু স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি পাওয়া গেছে, সেহেতু তোমার বেলায় কেসাসের হুকুম প্রযোজ্য। সেই বৃদ্ধের জানের বদলে জান দিতে হবে। যুবকটি মাথা নত করে আরয করলেন, শরীয়তের হুকুম ও ইমামের রায় মানতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে একটা বিষয়ে আবেদন করতে চাই। জিজ্ঞোস করা হলো, বিষয়টা কী? আমার একজন ছোট অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই আছে, যার জন্য আমার মরহুম পিতা কিছু স্বর্ণ রেখে গেছেন, যেটা আমার জিম্মায় আছে। আমি সে গুলো এক জায়গায় পুঁতে রেখেছি এবং এর খবর আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি যদি সেই স্বর্ণগুলো ওকে হস্তান্তর করতে না পারি, তা হলে কেয়ামতের দিন আমি দায়ী হবো। এ জন্য আমাকে তিন দিনের জন্য জামিনে ছেড়ে দেয়ার আবেদন করছি।

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করলেন। অতপর বললেন, তিন দিন পর কেসাসের হুকুম কার্যকরি করার জন্য তুমি যে ফিরে আসবে এর জামিন কে হচেছ?

ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ বক্তব্যের পর যুবকটি চারিদিকে তাকিয়ে দরবারে উপস্থিত সবার চেহারার উপর চোখ বুলিয়ে নিল। অতঃপর হযরত আবু জর গিফারী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দিকে ইশারা করে আরয করলো, ইনি আমার জামিন হবেন। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, আবু জর, তুমি কি এর জামিন হচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এর জামিন হচ্ছি। সে তিন দিন পর যথা সময়ে উপস্থিত হবে।

যেহেতু একজন বিশিষ্ট সাহাবী জামিন হলেন, সেহেতু হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) রাজি হয়ে গেলেন এবং বাদী যুবকদ্বয় সম্মতি প্রকাশ করলে ওকে ছেড়ে দেয়া হয়।

তৃতীয় দিন পুনরায় যথারীতি দরবার বসলো। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত হলেন, বাদী যুবকদ্বয় ও আসলো, হযরত আবু জর গিফারী তশরীফ আনলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে অপরাধীর আগমনের অপেক্ষায় রইলেন। সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই অপরাধীর কোন পাত্তা নেই।

www.sunnibarta.com

বাদীদ্বয় হযরত আবু জরকে জিজ্ঞোস করলেন, জনাব, আমাদের আসামী কোথায়? হযরত আবু জর পূর্ণ আস্থা সহকারে বললেন, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে না আসে, তাহলে খোদার কসম করে বলছি, আমার জামানত পূর্ণ করবো। হযরত ফারুকে আযম মসনদে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন এবং কিছুক্ষণ পর বললেন, সে যদি না আসে, তাহলে তার জিম্মাদার আবু জরের বেলায় সে হুকুম কার্যকরি হবে, যেটা ইসলামী বিধান মতে প্রযোজ্য।

এটা শুনামাত্র সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। অনেকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল এবং অনেকের চোখ দিয়ে পানি এসে গেল। তাঁরা বাধ্য হয়ে বাদীদ্বয়ের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা জানের বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ কর। ওরা অস্বীকার করে বললো আমরা রক্তের বদলে রক্ত চাই। সাহাবায়ে কিরামের এ পেরেশানী অবস্থায় হঠাৎ সেই অপরাধী যুবক এসে উপস্থিত হলো। তখন সে খুবই ঘর্মাক্ত ছিল এবং খুব ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছিল এবং আসা মাত্রই হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সামনে গিয়ে সালাম করলো এবং আরয করলো "আমি আমার ছোট ভাইকে মামাদের কাছে সোপর্দ করে এসেছি এবং ওর সহায় সম্পত্তি ওনাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন আল্লাহ ও রাসুলের যা হুকুম, তা কার্যকর করুন আমি প্রস্তুত।

হযরত আবু জর গিফারী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! খোদার কসম, আমি একে চিনিও না এবং সে কোথাকার লোক তাও জানি না। কিন্তু সে সবাইকে বাদ দিয়ে যখন আমাকে ওর জামিন বললো, তখন সেটা অস্বীকার করতে আমার বিবেক বাঁধা দিয়েছিল। তাই আমি ওর জামিনদার হয়ে গিয়েছিলাম।

সেই অপরাধী যুবক আরয করলেন, আমি হযরত আবু জরের শুকরিয়া আদায় করছি, আমি না আসলে ওনার বড় বিপদ হতো। কিন্তু মুসলমান যে কোন অবস্থায় স্বীয় ওয়াদা রক্ষা করে, কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করে না।

ওর আগমনে সবার মনে স্বস্তি আসলো, এমন কি বাদীদ্বয় সন্তুষ্টি হয়ে মহামান্য দরবারে আরয করলো, আমীরুল মুমেনীন! আমরা আমাদের পিতার রক্তের দাবী মাফ করে দিলাম।

এটা শুনা মাত্র উপস্থিত সবাই আনন্দে নারায়ে তকবীর বলে উঠলেন এবং হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর চেহারা মোবারকের খুশীর লক্ষণ ফুটে উঠলো এবং বাদীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের পিতার রক্তের বিনিময় আমি বায়তুল মাল থেকে আদায় করবো। বাদীদ্বয় আরয করলো, হুযূর আমাদের কিছু নেয়ার প্রয়োজন নেই আমরা কিছু নিব না।

পরিশেষে আনন্দঘন পরিবেশে আদালতের কার্যক্রম সমাপ্ত হলো। (মুগনিউল ওয়ায়েজীন ৪৭৯ পৃঃ)

সবক ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) ছিলেন মানবতাবাদী, সদ্বাচরণকারী এবং ওয়াদা পালনকারী। মৃত্যুদন্ড-এর আসামী হওয়া সত্ত্বেও ওয়াদা মুতাবেক যথা সময় এসে গিয়েছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ওয়াদা রক্ষাকারী ও সত্যিকার মুসলমান ছিলেন। কিন্তু আজকাল আমরা ওয়াদার প্রতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করি না।

উপযুক্ত বিচার

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) মিসরের গভর্ণর ছিলেন। একবার হযরত আমর ইবনুল আসের ছেলে এক মিসরী যুবকের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিল এবং মিসরী যুবকটি অগ্রগামী হয়েছিল। এতে হযরত আমর ইবনুল আসের ছেলে রেগে মিসরী যুবকটিকে দোর্রা মারলো। মিসরী যুবকটি এ জুলুমের ফরিয়াদ নিয়ে হযরত ফারুকে আযমের দরবারে হাজির হলো এবং আরজি পেশ করলো যে,

ওকে গভর্ণরের ছেলে অনর্থক দোর্রা মেরেছে। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত আমর ইবনুল আসকে পেয়ে গভর্ণর ছেলে সহ হাজির হলেন। আমীরুল মুমেনীন ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) মিসরী যুবককে নির্দেশ দিলেন দোর্রা হাতে নাও এবং তোমাকে যে দোর্রা মারছে, ওকে মারো। তখন সে বদলা নিতে শুরু করলো এবং ফারুকে আযম বলতে ছিলেন, আরো মারো। হযরত আনস (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, সে এতটুকু মেরেছিল যে, আর যেন না মারে আমরা সেটাই কামনা করছিলাম। যখন মিসরী যুবকটি ওকে দোর্রা মারা থেকে অবসর হলো, তখন ফারুকে আযম ফরমালেন, এবার এ দোর্রাটি আমর ইবনুল আসের মাথার উপর রেখো। কারণ, তিনি তথাকার গভর্ণর ছিলেন। তিনি কেন বিচার করলেন না এবং কেন ছেলের পক্ষপাতিত্ব করলেন? মিসরী যুবকটি আরয করলো, হে আমীরুল মুমেনীন! ওনার ছেলে আমাকে মেরেছিল, আমি ওর থেকে বদলা নিয়েছি। ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বললেন, তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে কখন থেকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছ? অথচ ওরা মায়ের পেট থেকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়েছিল। হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আমি কিছুই জানতাম না এবং এ লোকটি আমার কাছে কোন অভিযোগ করেনি। তখন ফারুকে আযম ওনাকে মাফ করে দিলেন। (আল আমন ওয়াল উলা- ২৪৫ পৃঃ)

www.sunnibarta.com

প্রশ্নোত্তর (আক্বিদা ও আমল)

মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন

প্রশ্ন :- কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিয়াম কি? নবী ও সাহাবীদের যুগে নাকি কিয়াম ছিলনা এবং কুরআন হাদীসে নাকি এর কোন প্রমাণ নাই এবং দাড়াইয়া কিয়াম করা নাকি বেদাত এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : - সাধারণত কিয়াম শব্দের অর্থ দন্ডায়মান হওয়া আর প্রচলিত অর্থে কিয়াম বলা হয় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ পড়ার সময় সম্মানার্থে দন্ডায়মান হওয়া। আর রাসূলের প্রতি তাজিম বা সম্মান প্রদর্শন উম্মতের উপর ওয়াজিব যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ

রাসূলকে সম্মান করো এবং তার মহত্ত্ব বর্ণনা করো। (সূরা ফাতহ, আয়াত -৯)

আলোচ্য আয়াতের এই হুকুম সর্বকালে সর্বোত্তম তাজিম ও মুহব্বত হলো একাগ্রচিত্তে দাড়িয়ে সালাম পেশ করা। সাহাবায়ে কেরাম নবীজির আগমনে সম্মানের জন্য দাড়াতেন আবার মজলিশ শেষে বিদায়ের কালেও দাড়িয়ে সম্মান জানাতেন। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ [ص:১৩৩৩] يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قد دخل بعض بيُوت أزوَاجه

অর্থাৎ :- হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে আমাদের মাঝে বসে পবিত্র হাদিস শরীফ রাযান করতেন। অতঃপর তিনি যখন মজলিস হতে দাঁড়িয়ে যেতেন, আমরাও তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং ততক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতাম যতক্ষন না দেখতাম যে তিনি কোন বিবির ঘরে প্রবেশ করেছেন। (বুখারী শরীফ, মিশকাত - ৪০৩ পৃষ্ঠা)

হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) বলেন অত্র হাদীস শরীফ দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার - সম্মানার্থে কিয়ামের স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়। সাহাবীগণ হুজুরের উপস্থিতিতেই কিয়াম করতেন। সুতরাং যে সমস্ত হাদীসে কিয়াম না করার কথা এসেছে তা ছিল নবীজির বিনয় প্রকাশ, নিষেধাজ্ঞা সূচক নয়। (সূত্র - লুমআত)

আরো সম্মানার্থে দাড়ানোর নির্দেশ স্বয়ং নবীজি দিয়েছেন। যেমন হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে নবীজি আনসারদেরকে আগন্তক হযরত সা'দ বিন মাযাজ (রাঃ) এবং সম্মানার্থে দাড়ানোর নির্দেশনা প্রদান করে ইরশাদ করেছিলেন -

قوموا الى سيدكم -

অর্থাৎ - তোমাদের নেতার সম্মানে দাড়িয়ে যাও। (সূত্র - আবু দাউদ শরীফ, ৭০৮ পৃষ্ঠা বুখারী শরীফ জিহাদ মানাকিব মাগাজী অধ্যায় মিশকাত - ৪০৩ পৃষ্ঠা)

কুরআন হাদীসের দলিল দ্বারা বুঝা যায় যদি কারো সম্মানার্থে দাড়ানো যায় সেক্ষেত্রে সৃষ্টিজগতের প্রাণ, সমস্ত নবীদের সর্দার রাহমাতুল লিল আলামীনের সম্মানার্থে কিয়াম করা কতবড় ইবাদত হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। বিশ্ববিখ্যাত ইমাম আল্লামা তক্কীউদ্দীন সুবকী (রাঃ) নবীজির নাম উল্লেখ করলেই দাড়িয়ে যেতেন (সম্মানার্থে) আর তিনি ছিলেন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে সর্বজন সমাদৃত। (দ্রঃ সিরাতে হালাভিয়াহ ১ম খন্ড- ৯৩ পৃষ্ঠা)

আর পঞ্চম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম গাজালী (রহঃ) বলেন -

والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العوالم مع أرواح الصحابة رضى الله عنهم لقد رآه كثير من الأولياء

অর্থাৎ :- রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের রূহসহ সমগ্র জগতে পরিভ্রমণ করার ক্ষমতা রাখেন এমনকি বহু আউলিয়ায়ে কেরাম নবীজিকে ভ্রমণ

অবস্থায় দেখেছেন। (তাফসীরে রুহুল বায়ান ৪র্থ ৪২৮ পৃষ্ঠা)

এভাবে আরো বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত নবীজি যখন যেখানে ইচ্ছা করেন সেখানে যে কোন মুহুর্তে হাজির-নাযির হতে পারেন। তাই আশেকে রাসূলেরা যখন প্রেমসাগরে ডুব দিয়ে নবীজির প্রতি সালামের হাদিয়া পেশ করে ইয়ানবী সালাম আলাইকা বলে ডাক দেয় তখন দয়াল নবী ঐ মজলিশে হাজির হতেও পারেন। তাই এমতাবস্থায়, কেউ বসে থাকলে তা যেমন বে-আদবী দেখায়, তেমনি অসৌজন্যও বটে।

তাই আমরা বলতে পারি, মিলাদ শরীফে কিয়াম করা মুস্তাহাব তথা ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। একে নাজায়েজ বিদআত ইত্যাদি বলা নিঃসন্দেহে গোমরাহী।

প্রশ্ন :- আমরা ওলামায়ে কেরামের মুখে শুনে থাকি- নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম আপন কবরে জীবিত। আবার অনেকেই ব্যাপারটি মানতে চায়না। উল্লেখিত বিষয়টি কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব। - মুহাম্মদ মুরশেদুল আলম, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

উত্তর :- ফয়যুল বারী শরহে বুখারীতে উল্লেখ আছে- "সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম নিজ নিজ রওযাতে স্ব-শরীরে জীবিত। সমস্ত হাক্কানী উলামা এ ব্যাপারে একমত। আমাদের প্রিয়নবী হুযুর আকরম মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওযা মোবারকে শুধু জীবিত নন; বরং সমগ্র জগত তার উসিলায় এখনও জীবিত, চলমান ও সক্রিয়। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে -

"وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعالَمِينَ" [الأنبياء: ١٠٧]

অর্থাৎ- আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত বানিয়েই প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া আয়াত- ১০৭) মূলতঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন সমগ্র জগতের প্রাণ ও চালিকাশক্তি। তিনি যদি মৃত হতেন - তাহলে জগতের অস্তিত্ব নিমিষেই বিলীন হয়ে যেত।

আমাদের প্রিয় নবীজির শান-মান তো অনেক উর্দ্ধে। অন্যান্য নবীগণও স্ব-স্ব কবর শরীফে জীবিত। যেমন - বায়হাকী রয়েছে- হযরত আনাস (রা:) কৃর্তক বর্ণিত হাদীস শরীফে নবীজি ইরশাদ করেন-

الا انبياء احياء فى قبورهم وهم يصلون -

অর্থাৎ- "নবীগণ স্ব-স্ব কবরে জীবিত আছেন এবং তারা তথায় নামায আদায় করছেন।" আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রাঃ) এই হাদীসকে সহীহ হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হাদীস নং- ১. নবীজি ইরশাদ করেন-

عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة؛ فإنه مشهود، تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي، إلا عرضت علي صلاته، حتى يفرغ منها» قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق»

অর্থাৎ- "তোমরা শুক্রবার আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো। কারণ, তা হল ইয়াওমে মাশহুদ বা ফিরিশতাদের উপস্থিতির দিন। ঐদিন ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়। যে কেউ আমার উপর দরূদ শরীপ পাঠ করে- ঐ দরূদ হতে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আমার উপর তা উপস্থাপিত হতে থাকে হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন- আমি জিজ্ঞাসা করলাম-আপনার ইন্তেকালের পরও কি এরূপ ঘটবে। নবীজি জবাব দিলেন- হ্যাঁ, ইন্তেকালের পরও পেশ করা হবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মাটির জন্য নবীদের দেহ মোবারক খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন"। রাবী বলেন- সুতরাং আল্লাহর নবী জীবিত ; তাঁকে রিযিকও প্রদান করা হয়। (অর্থাৎ নবীগণ সশরীরে জীবিত) সূত্র -ইবনে মাজাহ।

হাদীস নং -২

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلى : حياتى خير لكم ثلاث مرات – ووفاتى خير لكم ثلاث مرات – فسكت القوم – فقال

www.sunnibarta.com

পর্যন্ত কোন লোক মসজিদে নববীতে যেতে পারেনি। এমনকি-মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনও থাকতে পারেননি। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রাঃ) বলেন-" আমি প্রতি ওয়াক্তের নামাযের পূর্বে নবীজির রওযা মোবারক হতে আযানের আওয়াজ শুনতাম।" (মৃত নবী কি আযান দিতে পারে?)

সূত্র :- মিশকাত শরীফ ৫৪৫ পৃষ্ঠা। ওয়াফাউল ওয়াফা ১ম খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠা-কৃত ঃ আল্লামা সামহুদী (রাঃ)।

ফতোয়ার আলোকে হায়াতুন্নবী ঃ

মোল্লা আলী ক্বারী (রাঃ) বলেন ঃ-

انه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره كسائر الانبياء فى قبورهم -

অথাৎ "নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় রওযায় জীবিত আছেন - যেমনিভাবে অন্যান্য নবীগণও আপন আপন রওযায় জীবিত"। (শরহে শিফা ২য় খন্ড ১৪২ পৃষ্ঠা)।

এছাড়া - হায়াতুন্নবীর উপর কুরআন হাদীসের আলোকে নিম্নবর্ণিত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে - (১) জামউল ওয়াসায়েল (২) আমবাউল আযাকিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া-কৃত আল্লামা জালালুদ্দীন সুযূতী (৩) ফুয়ুজুল হারামাঈন-কৃত-শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (৪) তাফসীরে মাযহারী-কৃত আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (৫) আল মাওয়াহেদুল লাদুন্নিয়্যাহ্ -কৃত ইমাম কুস্তলানী (৬) যুরকানী আলাল মাওয়াহিব মাওয়াহিব-কৃত আল্লামা যুরকানী (৭) আল-হাভী লিল ফাতাওয়া-কৃত ইমাম সূয়ুতি (৮) আখবারুল আখইয়ার কৃত- আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (৯) তাফসীরে রূহুল বায়ান-কৃত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (১০) মসনবী শরীফ-কৃত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (১১) হাদায়িকে বখশীষ-কৃত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেয়া খান ব্রেলভী (১২) মাকালাতে কাজেমী- কৃত গাজ্জালিযে যমান আল্লাম আহমদ সাঈদ কাজেমী (১৩) জিকরে জমীল-কৃত আল্লামা মুফতী শফী ওকাড়ভী।

عمربن الخطاب بابى انت ولمى كيف يكون هذا ؟ قال حياتى خير لكم ينزل على الوحى من السما ء فاخبر كم بما يحل لكم وما يحرم عليكم – وموتى خيرلكم تعرض على اعمالكم كل خميس – فما كان من حسن حمدت الله عليه – وما كان من ذنت استوهبت لكم ذنوبكم -

অর্থাৎ - "হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত -হুযুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন - আমার হায়াত তোমাদের জন্য কল্যাণকর (একথা তিনবার বলেছেন)। আমার ওফাতও তোমাদের জন্য মঙ্গলকর,(একথাও তিনবার বলেছেন)। লোকেরা সবাই চুপ রইলেন। অতঃপর হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলে উঠলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার কদমে উৎসর্গ হোক, এটা কিভাবে সম্ভব? জবাবে নবীজি ইরশাদ করলেন-" আমার হায়াত তোমাদের জন্য কল্যাণকর একারণে যে, বর্তমানে আসমান হতে আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, আর আমি হালাল -হারাম বিষয়ে তোমাদেরকে সংবাদ দেই। আর আমার ওফাত এই জন্য কল্যাণকর যে, প্রতি বৃহস্পতিবার আমার কাছে তোমাদের সাপ্তাহিক আমলসমূহ একসাথে পেশ করা হয়। সেসব আমল যদি ভাল হয়, তাহলে আমি আল্লাহর প্রশংসা করি। আর যদি কোন গুনাহ হয়, তাহলে তোমাদের গুনাহ ক্ষমার জন্য আমি মাগফিরাত কামনা করি।" (আমার হায়াত মউতের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।)

সূত্র :- হজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ফী মুজিযাতি সাইয়িদিল মুরসালীন কৃত আল্লামা ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল আল-নাবহানী ৭১৩ পৃষ্ঠা। আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা ১ম খন্ড ৮২৬ পৃষ্ঠা কৃত- আল্লামা ইবনে জওযী।

বুঝা গেল- তিনি এখনও জীবিত এবং উম্মতের আমলসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি উম্মতের মাগফিরাত কামনা করছেন। মৃত হলে তো নিষ্ক্রিয় থাকতেন।

এজিদের শাসনমলে মদিনার হাররার যুদ্ধকালে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রাঃ) পাগল বেশে মসজিদে নববীতে লুকায়িত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। তিনদিন